প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প

বুদ্ধদেব বসু

প্রেমপত্র

১

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বর্ষাতি গায়ে হাঁটতে-হাঁটতে মাঝে মাঝে একটু থামছিলেন তিনি—ফুশফুশ ভ'রে নিশ্বাস নেবার জন্য, কয়েক ঢোঁক হালকা হাওয়া গিলে নেবার জন্য। ভারি ভালো—এই ঝিরঝির বৃষ্টি, এই টাটকা হাওয়া যেন সদ্য-ঘুম-ভাঙা, এই শান্ত সরু বাঁকা গলিটি, যা—একটু বন্ধুর যদিও, পাথরে বাঁধানো, একটু বেশি পরিচ্ছন্ন আর একটু বেশি জনবিরল—তবু ঝাপসাভাবে স্মরণে আনে বেলতলা রোড। তাহ'লে···ফিরে যাচ্ছি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই: আমার চাকরি, আমার পরিবারবর্গ, আমার 'বাক্' পত্রিকা, আমার ভাষাবিজ্ঞান-পরিষৎ—সব কলকাতায়, আমি না-ফিরলে কলকাতার চলবে কেন? কিন্তু তার এখনো তিনদিন দেরি আছে।

একটা চৌরাস্তা পাওয়া গেলো, কাফে, ডাইনে এক ডরিক-স্তম্ভযুক্ত অট্টালিকার সামনে সখীপরিবৃতা ডায়ানা, একটা বড়ো রাস্তা স্কুটারের শব্দে স্ফুটমান। এটা রোম, আমি রোমে এসেছি, স্মৃতি আর সৌন্দর্যে ভরা অফুরন্ত নগরে—এইমাত্র পৌঁছলাম, এই প্রথমবার।···এর পর? ডায়ানাকে পাশ কাটিয়ে পরের গলিটা—তা-ই না বললো হোটেলের মেয়েটি? মনে হচ্ছে ঐ রাস্তা···ঠিক! আবার একটা সরু পাথুরে গলি, দু-দিকে ছোটো-ছোটো দোকান—আসবাব, রুপোর বাসন, জামা-কাপড়, বই—কাচের পিছনে চারটে ভাষার নতুনতম বই—ঢুকতে লোভ হয়, কিন্তু এখন থাক: আগে চিঠি। বৃষ্টি থেমে এলো, শেষ কয়েক বিন্দুর উপর ভেসে উঠলো রোদ্দুর, উদ্ভাসিত হ'লো মস্ত বড়ো চৌকো চত্বর—লোকের ভিড়, ট্যাক্সি এসে থামছে, দুটো ঘোড়ায় টানা ফীটন-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অতিশৌখিন ভ্রমণেচ্ছুদের জন্য—আর চত্বর যেখানে শেষ হ'লো সেখানেই এক সোপানশ্রেণী; উঁচু, উদার, গরীয়ান, পুঞ্জীভূত নিঃশব্দ অভ্যর্থনার মতো। এ-ই, তাহ'লে, পিয়াৎসা দি স্পানিয়া। চেয়ে দেখার জন্য থামলেন না তিনি, দ্রুত এগিয়ে এলেন,

চোখে পড়লো একটা দেয়াল—ফলকে বিনীত বিজ্ঞপ্তি : কীটস-শেলি হাউস। ঐ তেতলার ঘর—ঐ জানলা, যা দিয়ে মাঝে-মাঝে তাকিয়ে থাকতো এক ভিনদেশী যুবক, এক অখ্যাত, মুমূর্ষু কবি—কিছু না-দেখে, কিছু না-বুঝে। আর কয়েক মিনিট পরেই আমি পৌঁছবো সেই ঘরে, দেখবো সেই জানলা থেকে হিস্পানি সোপান—যে-আমি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত দিল্লিকে আমার পশ্চিম সীমান্ত ব'লে ভেবেছিলাম। শেলি-কীটস আমাকে কয়েক মুহূর্ত ক্ষমা করুন : আগে চিঠি।

সামনের ফোয়ারাটার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেও তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন ; দুটো বাড়ি পরেই আমেরিকান এক্সপ্রেস।

গ্রীষ্মকাল, মার্কিন ট্যুরিস্টের ভিড়, লম্বা লাইন প্রত্যেক কাউন্টারে। আট-দশজনের পিছনে তিনি দাঁড়িয়েছেন। দেখছেন খোপে-খোপে সাজানো চিঠিগুলো—নানা রঙের খাম, হাওয়াই-ডাকের লাল নীল হলদে সবুজ নিশেন-ওড়ানো, ঝলমলে টিকিটে যেন মুকুট-পরানো—তার ভিতরে কত ভাষা, কত আশা, কত সুখ, কত সান্ত্বনা। ঐ হালকা ছাইরঙের খামটা মনে হচ্ছে···না, ওটা অন্য একজনকে দেয়া হ'লো। চোখ দিয়ে অনেক খুঁজে-খুঁজেও যেন তাঁর চেনা ছাইরঙা খামটি কোথাও দেখতে পেলেন না। তবে কি একটা এয়ার-লেটার মাত্র, না কি দুই ছত্রের ছবি-পোস্টকার্ড? না কি এমনও হ'তে পারে যে ঐ অগুনতি এনভেলাপের মধ্যে একখানাতেও তাঁর নাম লেখা নেই?

হঠাৎ মনে হ'লো গরম; গা থেকে বর্ষাতি খুলে হাতের ভাঁজে নিলেন।

কে সেই দূরের বন্ধু, যার চিঠির জন্য তিনি এত ব্যাকুল? দুঃখের বিষয়, এই প্রশ্নের উত্তর বড়ো গতানুগতিক। এক নারী, যার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো—আকস্মিকভাবে, দুঃসহভাবে—বিশাল আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের কোনো শহরে, যার জন্য অনেকগুলো সপ্তাহ ধ'রে তাঁর দিন হ'য়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত, আর রাত্রি উত্তাল, আর এখন যার অনুপস্থিতি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—য়োরোপের শহর থেকে

শহরে, দেশ থেকে দেশে, অবিরাম। আর অবিরাম সেই নারীর চিঠি, সব দেশে, সব শহরে, ট্রেনে যেতে-যেতে, রেস্তোরাঁয খেতে-খেতে, কোনো নদীর ধারে বেঞ্চিতে ব'সে, কোনো ম্যুজিয়মের সিঁড়িতে ব'সে : ভ্রমণকালে যা-কিছু তিনি দেখেছেন, যত দৃশ্য, যত চিত্র, যত প্রাসাদ, যত পুরোনো পুঁথি—সব-কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে ঢেউয়ের মতো উঠছে আর পড়ছে সেই চিঠিগুলো, তাঁর প্রৌঢ় রক্তে গোপন এক চঞ্চলতা, কোনো অসুখের আরম্ভের মতো উত্তেজক ও সুখদায়ক। তিনিও লিখেছেন অবশ্য—সারাদিনের ক্লান্তির পর হোটেলের ঘরে রাত্তির জেগে, কখনো কোনো নতুন শহরে পৌঁছানোমাত্র, কখনো বা পথ চলতে-চলতে মনে-মনে বাক্য রচনা করেছেন যা লিখতে গিয়ে পরে আর মনে পড়েনি। কোনো উল্লেখযোগ্য খবর দেবার নেই, কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার নেই, এমন কোনো কথাও নেই যা নতুন : তবু—লিখতেই হয। লিখতে হয় এমন এক ভাষায যা দু-জনের পক্ষেই বিদেশী, অন্যজন তবু মাঝে-মাঝে তার মাতৃভাষা জর্মান ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তিনি পাঁচটা য়োরোপীয় ভাষা পড়তে পারলেও লিখতে পারেন শুধু সেই ইংরেজিটা, যা খুব ভালোভাবে জানেন ব'লে এতকাল তাঁর ধারণা ছিলো। কিন্তু মনের এই বিশেষ অবস্থায বিশেষ এক ব্যক্তিকে চিঠি লিখতে গিযে দেখলেন যে তিনি ইংরেজি বলতে যা বোঝেন, তা এক আঁটোসাঁটো কষ্টকর পোশাক মাত্র, যার মধ্যে তাঁর ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণাকে কোনোমতে তিনি ধরাতে পারেন, কিন্তু যা দিয়ে কোনো হৃদয়ের কথা বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কঠিন এই বাধা—কিন্তু তবু তাঁকে লিখতেই হয়। কী তোলপাড় তাঁর বুকের মধ্যে—তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো শব্দ খুঁজে পান না, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন সেই অন্যজন বাংলা জানে না ব'লে, আবার পরমুহূর্তেই কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়েন অদৃষ্টের কাছে, যেহেতু তাঁর জীবনে—ইতিমধ্যেই বার্ধক্যের ছায়া-পড়া তাঁর গতানুগতিক বাঙালি জীবনে—এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারলো।

এই রোমে তার শেষ চিঠি আসবে। শেষ, কেননা এখান থেকেই তিনি সোজা যাচ্ছেন কলকাতায়, আর তাঁর পক্ষে কলকাতা মানেই এক নিটোল, সুশৃঙ্খল, সুবিজ্ঞাপিত জীবন-বৃত্ত, যার অন্তর্ভূত হ'য়ে আছে বাইরে ঘরে আরো অনেকে, আর যার মধ্যে এমন-কিছুরই স্থান নেই, যা তাঁর পক্ষে বিশুদ্ধভাবে ব্যক্তিগত। তিনদিন পরে যেই পূর্বগামী প্লেনে উঠবেন, অমনি হারিয়ে যাবে মহাসমুদ্রের ওপারে, এক দূর-পশ্চিম মহাদেশের কোনো-এক অক্ষাংশরেখায়, তাঁর ঘুম-ভাঙানো দুঃখ-জাগানো বাসনাময়ী। যা ছিলো তুই হুলুস্থুলু হৃৎপিণ্ডে জীবন্ত, তা নিষ্প্রাণ মানচিত্রে আঁকা এক বোবা বিন্দুতে পরিণত হবে। সেইজন্য আজকের চিঠিটা খুব জরুরি।

কাউণ্টারের ওদিক থেকে আওয়াজ এলো : 'ইয়েস, স্যর ?'

'রে, বিরূপাক্ষ,' ব'লে তিনি পাসপোর্ট খুলে ধরলেন ; সুশ্রী ছোকরা কেরানিটি, যন্ত্রের মতো নিপুণ, মুহূর্তকাল পরেই তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করলো। খামটা চোখে দেখা মাত্র এক অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মনে, যেন সব দূরত্ব লুপ্ত হ'য়ে গেছে মুহূর্তের জন্য, জীবনে যেন বিচ্ছেদ ব'লে কিছু নেই। আর আমি কিনা ভাবছিলাম চিঠি বুঝি এলো না—এত ভাগ্যবান হ'য়েও এত অবিশ্বাসী আমি!

বিরূপাক্ষ স'রে গেলেন, দাঁড়ালেন দেয়াল ঘেঁষে এক নির্জন কোণে। সাবধানে খামের প্রান্তে নখ চালিয়ে-চালিয়ে চিঠি খুললেন। একখানা বড়ো মাপের কাগজ, শক্ত কড়কড়ে শাদা — কিন্তু বড্ড বেশি শাদা, অবিশ্বাস্যভাবে ধবল। কিছু লেখা নেই, একটি কালির ফোঁটা, কলমের আঁচড় নেই কোথাও—এপিঠ-ওপিঠ, উপর থেকে নিচে, এধার থেকে ওধার পর্যন্ত শাদা, নির্বাক, নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু উপর, নিচ, ডান, বাঁ— এই কথাগুলোরই বা অর্থ কী, যেহেতু কিছু লেখা নেই এটুকুও বোঝা যাচ্ছে না কাগজটা কোনদিকে ধরতে হবে। অথচ লেফাফার উপর হাতের লেখা নির্ভুল, এব্রাহাম লিঙ্কনের ছবির উপর ডাকঘরের মার্কা

নির্ভুল, আর লেফাফাটা—ফিকে ছাইরঙের, সারা গায়ে এরোপ্লেনের জলছাপ আঁকা, ফ্রান্সে প্রস্তুত, তাও নির্ভুলভাবে এবার।... তাহ'লে?

রাস্তায় বেরিয়ে রুমালে কপাল মুছলেন বিরূপাক্ষ, হঠাৎ বড্ড ভারি-হ'য়ে-ওঠা বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে ফুটপাতে দাঁড়ালেন। ঐ যে একটা কাগজের স্টল—অনেকদিন জগতের কোনো খবর রাখি না, কেমন চলছে দেখা যাক। দ্রুত-ধাবমান মোটরগাড়ির জন্য বিপজ্জনক রাস্তা সাবধানে পেরিয়ে এসে তিনি কিনলেন একখানা প্যারিসে ছাপা 'ন্যুয়র্ক হেরাল্ড-ট্রিবিউন', একখানা 'ল মঁদ', আগের দিনের একখানা 'ফ্রাঙ্কফুর্টার ৎসাইটুং' আর শেষ মুহূর্তে রোমের দ্রষ্টব্য বিষয়ে একটি ছোটো পুঁথি—কিনেই অনুশোচনা হ'লো নিজের উপর আবার এই কাগজগুলোর বোঝা চাপালেন ব'লে, সত্যি কি আমি এখন জগতের জন্য উৎসুক? আরো একবার রাস্তা পেরিয়ে, হিস্পানি সিঁড়ি ছাড়িয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ একটা সাইনবোর্ডের সামনে থমকে দাঁড়ালেন: 'ব্যাবিংটন টী-হাউস'। অপ্রত্যাশিত ইংরেজি ভাষায় ঐ লেখাটুকু দেখামাত্র তাঁর বাঙালি কণ্ঠে চায়ের তৃষ্ণা জেগে উঠলো—মনে পড়লো তিন সপ্তাহ আগে এডিনবরায় শেষ সত্যিকার চায়ের স্বাদ পেয়েছিলেন—য়োরোপীয় মহাদেশের অনেক-কিছু ভালো হ'লেও কেউ সেখানে চা বোঝে না, এবার এই ইংরেজ-নামাঙ্কিত চা-ঘরে হয়তো সত্যিকার ট্যানিন-রসে গলা ভেজানো যাবে। দোকানটিতে ঢোকামাত্র তাঁর ভালো লাগলো—শান্ত, চুপচাপ, আধো-অন্ধকার, দু-কোণে দু-জন মাত্র খদ্দের খুব ঝাপসা ও নিঃশব্দ হ'য়ে ব'সে আছে—ঐ জানলার ধারে টেবিলটি, চায়ের সঙ্গে জগতের খবর চেখে-চেখে বিশ্রান্ত আধ ঘণ্টা সময়—সম্ভাবনাটা রমণীয় ব'লে মনে হ'লো তাঁর। এগিয়ে বসলেন গদি-আঁটা বেঞ্চিতে, একটার পর একটা কাগজ খুলে প্রধান হেডলাইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেলেন, কিন্তু মনে হ'লো জগতে কিছুই ঘটছে না, অন্তত নতুন কিছুই ঘটছে না—কোনো মন্ত্রীর পদত্যাগ, কোনো নির্বাচনের ডামাডোল, দেশে-দেশে মনোমালিন্য,

খণ্ড যুদ্ধ, কপট মৈত্রী—কতকাল, কতকাল ধ'রে এই সবই দেখে আসছেন কাগজে, ভিন্ন-ভিন্ন নামে, ভিন্ন-ভিন্ন তারিখে, ঘুরে-ফিরে একই খবর। নিশ্বাস ছাড়লেন বিরূপাক্ষ, ক্লান্ত হাতে কাগজগুলোকে সরিয়ে দিলেন। একটি বেঁটে গোলাপি-গালের ইতালিয়ান মেয়ে রুপোর পটে চা নিয়ে এলো, তার ইস্ত্রি-করা ধবধবে শাদা পোশাকের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষর বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হ'লো।

সত্যি কি তা-ই? একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবল? আমি ভুল দেখিনি তো? সন্তর্পণে, চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, পকেট থেকে ছাই-রঙা লেফাফাটি বের করলেন—এবারেও ভিতর থেকে একখানা অচিহ্নিত কাগজ শুধু বেরোলো। কাগজটি তুলে একবার নাকের কাছে ধরলেন বিরূপাক্ষ, মনে হ'লো ক্ষীণ একটি সুবাস পাওয়া যাচ্ছে—তাঁর চেনা—এষার ব্যবহৃত সুগন্ধের মতো যেন। কী, কী হ'তে পারে? ··কী হ'তে পারে? এপিঠ-ওপিঠ দু-পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি লিখে, তারপর সে কি মনের ভুলে একখানা শাদা কাগজ ঢুকিয়ে দিয়েছিলো খামের মধ্যে? না, সম্ভব নয়, এক-লক্ষে-এক পরিমাণও সম্ভব নয় এ-রকম ভুল—বিশেষত এষার মতো মানুষের পক্ষে, অতি তীব্র আবেগের চাপেও যার আত্মস্থতা নষ্ট হ'তে আমি কখনো দেখিনি। কিন্তু যদি সেই লাখে-একই আমার ভাগ্যে ঘ'টে গিয়ে থাকে? যা সাধারণত হয় না, তা কখনোই হবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? কিন্তু ভুল যদি হ'য়ে থাকে, নিশ্চয়ই সেটা ধরা পড়েছে তক্ষুনি, আর সঙ্গে-সঙ্গে আসল চিঠিখানা ডাকে ফেলা হয়েছে? ··· কিন্তু—তাহ'লে—অন্যটি পৌঁছলো না কেন?

এক ধরনের ভদ্রতাবোধবশত আধ পেয়ালা চা খেলেন বিরূপাক্ষ, টেবিলে মোটা বখশিষ রাখলেন গোলাপি-গালের বেঁটে মেয়েটির জন্য, কাগজগুলোকে সেখানেই ফেলে দু-মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন আমেরিকান এক্সপ্রেসে।

'দয়া ক'রে একটু দেখবেন আমার আর-কোনো চিঠি আছে কিনা।'

কেরানিটি ধৈর্যশীলভাবে নির্দিষ্ট খোপে খুঁজে এসে বললো, 'সরি, স্যার।'

যুবকটির হলদে নেকটাইয়ের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ ঢোঁক গিললেন।

'বিকেলের দিকে আর-একবার ডাক আসবে কি?'

'বিকেলের ডাকে বিদেশী চিঠি আসে না। তাছাড়া আমরা খোলা থাকি তিনটে পর্যন্ত। আপনি কাল সকালে আবার খোঁজ নেবেন।'

বিরূপাক্ষ এই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে মানুষের জীবনে অন্য সব-কিছুর মতো, চিঠিও নিয়তিনির্ভর। কত সহজে আমরা ধ'রে নিই যে কোনো চিঠি লেখা হ'লেই ডাকে ফেলা হবে, ডাকে ফেলা হ'লেই যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছবে। অধিকাংশ চিঠি অধিকাংশ সময় গন্তব্য খুঁজে পায় তা সত্য, কিন্তু দিকভ্রষ্ট চিঠির কথাও কি শোনা যায় না মাঝে-মাঝে? আর পৃথিবী ভ'রে এই যে ডাক-চলাচলের ব্যবস্থা—আন্তর্দেশীয়, আন্তর্মহাদেশীয়, আন্তঃসামুদ্রিক—এই অতি জটিল ও অতি নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগের এই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যার ফলে আলাস্কার কোনো গ্রামের ডাকবাক্স থেকে উদ্ধৃত হ'য়ে কোনো চিঠি পাঁচ দিন পরে অবধারিতভাবে বিলি হয় ব্যাঙ্ককের কোনো গলির মধ্যে নম্বর-মুছে-যাওয়া জীর্ণ বাড়িতে—এও কি নয় এক বিস্ময়, যাকে অলৌকিক বললেও অত্যুক্তি হয় না? কত বিরাট সব ফাঁড়া হাঁ ক'রে আছে এর মধ্যে—কোনো কেরানির ক্লান্তি, কোনো হরকরার অমনোযোগ; জল, ঝড়, আগুন, যানবাহনের দুর্ঘটনা। ভাবতে গেলে কোনো চিঠি নির্বিঘ্নে হাতে পাওয়া তেমনি আশ্চর্য, যেমন আমাদের বছরের পর বছর ধ'রে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা; যে-কোনো চিঠি হারিয়ে যেতে পারে, যে-কোনোদিন আমরা ম'রে যেতে পারি বা হ'তে পারি আশাহীনভাবে রুগ্ন—অথচ এখনো নিষ্কল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বেঁচে আছি

ব'লে, বা এতকাল ধ'রে এত চিঠি পেয়ে আসছি ব'লে, আমরা কৃতজ্ঞ পর্যন্ত হ'তে শিখি না।

—কিন্তু আমি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করছি ব্যাপারটা নিয়ে; একটি প্রত্যাশিত পত্রকে কেন্দ্র ক'রে যে-বৃত্তে আমি এখন ঘুরছি তার বাইরে এক বিশাল জগৎ ছড়িয়ে আছে—খবর-কাগজের বুদ্‌বুদধর্মী জগৎ নয়, অন্য এক মায়াবী জগৎ, যার মধ্যে ধ্বংসস্তূপও সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হয়, আর জীবনের সব চাঞ্চল্যের উপর এমন একটি রঙিন আচ্ছাদন ছড়িয়ে পড়ে, যাকে আমরা স্থায়িত্ব ব'লে ভুল করি। এটা রোম, আমি রোমে আছি, এই প্রথম এলাম, আজ আর কালকের দিনটা শুধু থাকবো, অথচ বেলা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত কিছুই দেখলাম না!

মনস্থির ক'রে ট্যাক্সি নিলেন বিরূপাক্ষ; অনেক-কিছু দেখে, অনেকটা অর্থব্যয় ক'রে, ভালো ঘুম হবার জন্য ডিনারের সঙ্গে দেড় গ্লাশ কিয়াস্তি পান ক'রে—যথোচিতভাবে ক্লান্ত, অনভ্যস্ত ব'লে মদিরায় ঈষৎ ঝাপসা, রাত প্রায় এগারোটায় হোটেলে ফিরলেন। লিফটে উঠতে-উঠতে ঘুম পাচ্ছিলো, কিন্তু যে-মুহূর্তে চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আলো জ্বেলে দেখলেন একটি পরিপাটি বিছানা, জানলায় মেরুন রঙের পর্দা, শিয়রের টেবিলে খনিজ জলের বোতল—রুটিনমাফিক আরামের আয়োজন, যা যে-কোনো দেশেই টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়—সে-মুহূর্তে তাঁকে আচ্ছন্ন করলো সেই অবসাদ, যাকে প্রায় হতাশা বলা যায়, যা অনুভব করে হঠাৎ কোনো ভ্রাম্যমাণ কোনো রাত্রে যদি সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, ঘুমের চেষ্টা ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে মাঝে-মাঝে শিয়রের বাতি জ্বেলে দেয়, আবার তক্ষুনি আলো নিবিয়ে পাশ ফেরে, আর ঝাপসা আধো-ঘুমে অন্ধকারে তার মনে হয় সে শুয়ে আছে তার নিজের বাড়িতে অভ্যস্ত বিছানায়, ডাকলেই কেউ সাড়া দেবে, আর্তনাদ করলে ছুটে আসবে কোনো প্রিয়জন, যখন তার কল্পনা তাকে জপায় যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেশ তার দেশ, সবচেয়ে আরামের বিছানা যেটা হরিদাসী রোজ পেতে

রাখে তার জন্য, আর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য সেই পলেস্তরা-খসা তেতলা বাড়িটা, যেটাতে তার প্রথম চোখ পড়ে রোজ সকালে—আর তারপরেই মনে প'ড়ে যায় সে এখন আছে অনেক দূরে অন্য এক দেশে, সমস্ত রাত ছটফট ক'রে কাটালেও কাউকে কাছে পাবে না। মা একদিনের জন্যও অন্য কোথাও গেলে কোনো-কোনো শিশুর যেমন 'পরান পোড়ে' (ছেলেবেলার একটা বাঙাল কথা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো বিরূপাক্ষর), তেমনি এক কষ্ট তাঁকে অভিভূত করলো—অন্য কোথাও এ-রকম তাঁর মনে হয়নি—যেন চান ফিরে যেতে, শুধু ফিরে যেতে তাঁর নিজের বাড়িতে যেখানে আছে তাঁর আপন জনেরা, একমাত্র যেখানে তাঁর সুখ, তাঁর নিরাপত্তা। কিন্তু প্রশ্ন এই : কোনটা তাঁর স্বদেশ, কোথায় তাঁর বাড়ি, আর কে-ই বা তাঁর আপনজন।

বিরূপাক্ষ যান্ত্রিকভাবে শুতে যাবার জন্য তৈরি হ'তে লাগলেন; হাতের ঘড়ি খুলে, পকেটের জিনিশপত্র উজোড় করলেন টেবিলের উপর, পাজামা-পাঞ্জাবির উপর ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে ব'সে পড়লেন চেয়ারটায়। আজ সারাদিনে যা দেখেছেন সেগুলোকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন··· কোনো স্থির দীপ্তি, কোনো সমভাবসম্পন্ন স্বাধীন সত্তা, আমাদের আকস্মিক আনন্দ বা বেদনার যা বহির্ভূত—শেষ পর্যন্ত তা-ই কি আশ্রয় নয় মানুষের—যেমন তাঁর ভাষাবিজ্ঞান, কিংবা যেমন মিকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, দোনাতেল্লো, যাঁরা ভুলিয়ে দেন রেনেসাঁসের অকথ্য সব পাপ, বিষ, ছোরা, জ্যান্ত-পোড়ানো হাজার মানুষের যন্ত্রণা।··· কিন্তু আমি শুধু নাম আউড়ে যাচ্ছি, বইয়ের বুলি ভাবছি, আমি কিছু দেখিনি। বিচ্ছেদ ঘটেছে আমার চোখের সঙ্গে মনের, যুদ্ধ চলছে শরীরের সঙ্গে আত্মার, আমি যেখানে আছি আমি সেখানে নেই। কিছু বলো, এষা, কিছু বলো আমাকে—আমাকে রোম দেখতে দাও। এই আমি প্রথম এসেছি, হয়তো আর কখনো আসবো না।

হালকা ঝকঝকে মূল্যহীন ইতালিয়ান মুদ্রা, রাশীকৃত ইতালিয়ান নোটের চাপে ফুলে-ওঠা ওয়ালেট, ঠিকানার খাতা, পাসপোর্ট, আজে-বাজে টুকরো কাগজ—এই সবের মধ্য দিয়ে তাঁর হাত যেন তাঁকে অমান্য ক'রে এগিয়ে গেলো। আবার সেই শাদা কাগজ, সবুজ ঢাকনা-দেয়া টেবল-ল্যাম্পের আলোয় নীলচে। যেন আছে, কোনো কথা লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে, ডালিমের শক্ত খোলশের তলায় দানার মতো—যা যেন নির্জন ঘরে দর্পণের শূন্যতা, কোনো দরজা খোলা হ'লে, কোনো পর্দা স'রে গেলে, যে-কোনো মুহূর্তে যা ভ'রে উঠতে পারে। কাগজটাকে আলোর গায়ে তুলে ধরলেন বিরূপাক্ষ, তখন সেটা দেখালো ডিমের খোলার মধ্যে শাঁসের মতো হলদে-সোনালি। টেবিলের উপর টান ক'রে পেতে দেখতে লাগলেন আরো মন দিয়ে, উজ্জ্বলতর আলোর জন্য ল্যাম্পের গলাটা খুব কাছে নামিয়ে আনলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরে মনে হ'লো যেন ঝাপসা দু-একটা অক্ষর দেখা যাচ্ছে এখানে-ওখানে। বিরূপাক্ষ চোখ ঘষলেন, তাঁর পুরোনো পুঁথি প'ড়ে অভ্যস্ত চোখের সবটুকু জ্যোতি সংহত করলেন ঐ কাগজখানার উপর; আরো কয়েকটা অক্ষর ফুটে উঠলো।

হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গেলো বহুদিন আগে এক গোয়েন্দা-গল্পে অদৃশ্য কালির কথা পড়েছিলেন কাগজটা আগুনে সেঁকলেই লেখা ফুটে ওঠে। আরো আগে, যখন স্কুলে পড়েন, কে যেন বলেছিলো পাতিলেবুর রসে নিব ডুবিয়ে লিখলেও ঠিক অমনি হয়, নিজে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন কথাটা ঠিক।... তাহ'লে—এই ব্যাপার! সাবধানে দু-হাতে তুলে বাল্‌বের ঠিক তলায় ধরলেন কাগজটা; তাঁর চোখের সামনে, যেমন ফট-ফট খই ফোটে কড়াইয়ে, বা ভোরবেলার আলোর ছোঁওয়ায় কুঁড়িগুলি ফুল হ'য়ে ওঠে, তেমনি বেরিয়ে আসতে লাগলো শাদার উপরে কুচকুচে কালো অক্ষরগুলি, একটা দিক ভর্তি হ'য়ে গেলো। এবারে উল্টো পিঠ—এটাতে বেশি সময় লাগলো না।

আর এখন—বার্তা, ভাষা, আশ্বাস, সেই দূরবাসিনীর হৃদয়ের ক্ষরণ, কানায়-কানায় ভরা এক পাত্র—তাঁর সামনে, তাঁর অধরস্পর্শের অপেক্ষায়। একটুও অবাক হলেন না বিরূপাক্ষ, কোনো উত্তেজনা অনুভব করলেন না—বরং মনে হ'লো এটাই স্বাভাবিক ও যথোচিত, মনে-মনে নিজেকেই দোষ দিলেন এষার এই ছোট্ট নির্দোষ চাতুরীটুকু প্রথমেই ধরতে পারেননি ব'লে। কিন্তু একটু পরেই তাঁর কপালে গাঢ় হ'য়ে রেখা পড়লো, ভারি হ'লো নিশ্বাস, মুহূর্তের জন্য নিজের প্রকৃতিস্থতা বিষয়ে সংশয় জাগলো।

চিঠিখানা এমন এক ভাষায় লেখা, যা তিনি জানেন না।

লম্বা চিঠি, এপিঠ-ওপিঠ ভরা অক্ষর, কাটাকুটি নেই, লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে ছাড়া শাদা নেই কোথাও, কিন্তু তিনি—ইন্দো-য়োরোপীয় ভাষাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, অনেকগুলো ভারতীয় আর য়োরোপীয় ভাষা নিয়ে যিনি সর্বদা কাজ ক'রে থাকেন—সেই তিনি তাঁর সামনে মেলে-ধরা কাগজখানার একটি শব্দেরও ঘোমটা সরাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তাঁর প্রতীতি জাগলো যে চিঠিটা এক সাংকেতিক ভাষায়, হেঁয়ালির আকারে লেখা হয়েছে, কেননা এতে দেখা যাচ্ছে বহু ভিন্ন-ভিন্ন লিপি—রোমান হরফের ফাঁকে-ফাঁকে গ্রীক, রুশ, হিব্রু, গথিক, দেবনাগরি, কোনোটাকে ব্রাহ্মী লিপি ব'লে সন্দেহ হয়—এমনকি মাঝে-মাঝে চৈনিক চিত্রাক্ষর, প্রাচীন মিশরী প্রতীকবর্ণ, এমনকি মাঝে-মাঝে বাংলাও, আর কখনো বা এমন কোনো-কোনো চিহ্ন, যা বিরূপাক্ষর অনুমানেরও অতীত। শুধু, উল্টো পিঠের একেবারে তলায় মার্জিন ঘেঁষে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লিখেছে 'এষা' (এটুকু তাকে বিরূপাক্ষই মকশো করিয়েছিলেন), আর তাতেই বোঝা গেলো কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, আর সেই একটি কথাই শুধু পড়া গেলো।

নিচু, নরম গলায় বিরূপাক্ষ হেসে উঠলেন। আমাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছে, আমি কেমন ভাষাবিদ! মৃদু ঠাট্টা করতো আমাকে, যখন

অভ্যাসদোষে কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি তাকে বোঝাতে যেতাম, চাইতাম তাকে বাংলা শেখাতে, সংস্কৃত শেখাতে। সে বলতো, 'আমেরিকায় এই বারো বছর কাটিয়েও ইংরেজিটা ঠিক রপ্ত করতে পারলাম না—এর ওপর আবার আরো! রক্ষে করো!' তার যুক্তি ছিলো যে অনেকগুলো ভাষা শিখলে কোনো ভাষাই শেখা হয় না, এবং অনেক শেখার পরেও আরো অনেক অজানা ভাষা অবশিষ্ট থাকবেই। আমি বলতাম, কিন্তু যেটুকু শেখা যায় সেটুকুই লাভ। তা হ'তে পারে, কিন্তু যে-কোনো অবস্থায় মানুষের অজ্ঞতা অসীম—এটা তো মানবে। কৌতুকহাস্যে শেষ হ'তো এই তর্ক—কিন্তু এখন, যেন তার সেই কথারই সত্যতা প্রমাণের জন্য এই চিঠি পাঠিয়েছে আমাকে, চোখে আর ঠোঁটে বিদ্যুৎ হেনে যেন আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে—কেমন। পড়ো দেখি এটা! ··· একটু সময় দাও আমাকে, একটু সময় দাও—দ্যাখো তোমার সব চাতুরী ধ'রে ফেলছি।

কিন্তু সে, আমি যার নাম দিয়েছিলাম এষা, যে ছেলেবেলায় তার ঠাকুরমার মুখে-মুখে কয়েকটা হিব্রু আর ইডিশ শব্দ শিখেছিলো, আর তার এককালীন স্বামীর সংসর্গে খানিকটা রাশিয়ান, কিন্তু সত্যি বলতে জর্মান আর ইংরেজি ছাড়া কোনো ভাষাই যে জানে না—তার পক্ষে এ-রকম একটা বিশ্বস্তর হেঁয়ালিরচনা কি সম্ভব? একেবারে সম্ভব নয় তা-ই বা কী ক'রে বলি, কেননা অনেক সাধারণ অভিধানেই হিব্রু, রুশ, গ্রীক, বর্ণমালা পাওয়া যায়, হয়তো আমারই ফেলে-আসা কোনো বই থেকে দু-চারটে বাংলা আর দেবনাগরি অক্ষর চিনে নিয়েছে, আর আমি যেগুলোকে ভাবছি চৈনিক, মিশরী, ব্রাহ্মী লিপি, সেগুলি হয়তো তার নিজেরই উদ্ভাবিত কোনো রেখাঙ্কন—হয়তো সেগুলো দিয়ে পাণ্ডুলিপিকে অলংকৃত করা হয়েছে শুধু, যেমন অনেকে পরবর্তী বাক্যটি ভাবতে-ভাবতে কাগজের মার্জিনে ছবি আঁকে, তেমনি। ··· কিন্তু এমন যদি হয় যে পুরো চিঠিখানাই অর্থহীন, এক শূন্যগর্ভ শিল্পিত পেটিকামাত্র—তাছাড়া

আর-কিছু নয়? দ্যাখো না—হাতের লেখাটাও কেমন কৃত্রিম, রোমান অক্ষরগুলো ছাপার হরফের মতো, যেখানে-সেখানে ক্যাপিটেল ছিটোনো—মাঝে-মাঝে এষার লেখার আদল এলেও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মনে হয় বহু সময় নিয়ে বহু ধৈর্য ধ'রে লিখতে বা আঁকতে হয়েছিলো এই চিঠি—কিন্তু অত সময় সে কখন পেলো, কী ক'রে অমন ধৈর্যশীল হ'তে পারলো সে, আমি তাব নিজের কণ্ঠ শোনার জন্য কত ব্যাকুল, তা জেনেও?

এষা, এই পরিহাস কেন?

—পরিহাস? তবে কি সে আমাকে তার সর্বস্ব দেয়নি, কিছু হাতে রেখেছিলো? তবে কি এই শেষ মুহূর্তে, শেষ বিদায়েব আগে, সে চাচ্ছে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে, বাতিল ক'রে দিতে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—সে, আমার হৃদয়বতী নির্ঝরিণী? ··· না, না, তা হ'তে পারে না, হ'তে পারে না। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। ঐ তো আছে তার স্বাক্ষর—স্পষ্ট, আমার সবচেয়ে চেনা ভাষায় সবচেয়ে প্রিয় দুটি অক্ষর—আমি কি এত দুর্বল যে এর পরে আরো প্রমাণ চাইবো? মিথ্যে নয়, পরিহাস নয়, আমি পারবো এর বার্তা বুঝে নিতে—আমাকে পারতেই হবে।

এক ঘণ্টা কাটলো, তবু বিরূপাক্ষর কপাল মসৃণ হ'লো না, তাকিয়ে থেকে-থেকে চোখের মধ্যে টনটন করতে লাগলো। আবার যেন নৈরাশ্য ঘিরে ধরলো তাঁকে, ক্লান্তির চাপে ভেঙে পড়ছে শরীর, কিন্তু ঘুম নেই, মনের এই অবস্থায় শুতে যাওয়া অসম্ভব। এষা, বলো আমাকে, এর অর্থ কী, বলো—যদি হয় প্রত্যাখ্যান, তাও ব'লে দাও। আর দু-দিন পরেই দুস্তর ব্যবধান—তার আগে আমাকে বলো তোমার শেষ কথা—বলো, আমার এই বেদনাদীর্ণ জাগরণ, তা কি সত্য? তা কি সত্য নয়?

টেবিলের উপর টেলিফোনটাতে চোখ পড়লো তাঁর। হাত-ঘড়িতে দেখলেন দেড়টা। মধ্য-পশ্চিম আমেরিকায় এখন সন্ধ্যা সাড়ে-আট—খুব সম্ভব বাড়িতেই আছে এখন, ডিনার সেরে, বাসনকোশন ধুয়ে,

একলা ব'সে 'লাইফ' পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে, বা টেলিভিশনে খবর শুনছে হয়তো—আর কী করার থাকে সন্ধের পরে মফস্বলি মার্কিনী মানুষের? কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বিরূপাক্ষ একটা দূরপাল্লা নম্বর চাইলেন।

হাওয়ায় ভাসা মেয়েলি গলা পর-পর—রোম, ন্যুয়র্ক, শিকাগো—যেন প্রায় চিন্তার মতোই দ্রুত কোনো তরঙ্গ ভেসে চলেছে—দু-এক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর স্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেলো, 'হ্যালো।'

মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস নিতে পারলেন না বিরূপাক্ষ। এষার গলা—অবিকল তার, একটু ভারি, যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, যেন আর-একটু হ'লেই মুখ দেখা যাবে। তাঁর কানের মধ্যে ঐ নৈর্ব্যক্তিক 'হ্যালো' শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে একটু সময় লাগলো।

আবাব ওপার থেকে : 'হ্যালো।'

'আমি বিরূপাক্ষ, রোম থেকে বলছি।'

'তুমি! আশ্চর্য—আমি ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলাম। কেমন আছো?'

'তুমি আমাকে চিঠি লিখেছিলে—রোমের ঠিকানায়?'

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। পাওনি?'

'পেয়েছি—কিন্তু সেটা কোনো চিঠি কিনা বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছো না?' ঝাপকা একটু হাসির আওয়াজ ভেসে এলো।

'একটা বর্ণ বুঝতে পারছি না, এষা। তুমি করেছো কী?'

'আমি তোমাকে সারাক্ষণ চিঠি লিখে চলেছি।'

'সারাক্ষণ?'

'সারাক্ষণ। মনে-মনে। সব কথা লেখা যায় না জানো তো।'

'কিন্তু এই চিঠিটা—শোনো—কী লিখেছিলে এটাতে? কোন ভাষায় লিখেছিলে? বলো, এষা, উত্তর দাও—কী লিখেছিলে? কোন ভাষায়?'

'তুমি জিগেস করছো কী লিখেছিলাম ? কোন ভাষায় ? তুমি !' আবার ঝিরঝির হাসি।

'এষা — আমাকে দয়া করো — বলো, কী লিখেছিলে !'

'লিখেছিলাম—' এর পরেই অদ্ভুত একটা আওয়াজ এলো, যেন এবার কণ্ঠ আর নয়, কোনো ফাঁস-লাগা গলা থেকে বেরোনো অক্ষম অর্ধোচ্চারিত হিজিবিজি।

নিজের গলায় চীৎকার শুনলেন বিরূপাক্ষ — 'বলো ! বলো ! কী লিখেছিলে ?'

'লিখেছিলাম—' আবার সেই অদ্ভুত, বিকৃত আওয়াজ। যেন কোনো কথা আরম্ভ হ'য়েই বেঁকে-চুরে দুমড়ে যাচ্ছে, যেন দম-ফুরোনো সেকেলে গ্রামোফোনে ভাঙা রেকর্ডের আর্তনাদ, বা কোনো বাঁদর যেন মানুষের নকলে কথা বলার চেষ্টা করছে। বিরূপাক্ষ যতবার ডাকেন, 'এষা ! এষা !··· শুনছো ?' ততবার সেই একই শব্দ।

তারপর টেলিফোন কেটে গেলো। ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে বিরূপাক্ষ আবার সেই একই নম্বর চাইলেন, অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর অপারেটর জানালো আটলান্টিকে ঝড় উঠেছে, কাল সকালের আগে লাইন পাওয়া যাবে না।

বিরূপাক্ষ টের পেলেন তিনি কাঁপছেন, গাল বেয়ে তিরতির ক'রে ঘাম নামছে। জানলার পর্দা সরিয়ে আধখানা শার্সি খুলে দিলেন, কয়েক ঢোঁক খনিজ জল খেয়ে আবার বসলেন চিঠির সামনে।

কী কথা হ'লো টেলিফোনে ? কিছুই না, শুধু জানা গেলো যে এষা চিঠি লিখেছিলো। কিন্তু··· সেটুকু জানাও তো অনেকখানি। হ্যাঁ, লিখেছিলো, কিন্তু এটাই যে সেই চিঠি তার কী প্রমাণ ? 'বুঝতে পারছো না ?··· তুমি জিগেস করছো কী লিখেছিলাম ? তুমি !' আবছা হাসি, সস্নেহ, কিন্তু ঈষৎ যেন ঠাট্টাও মেশানো আছে, যেন অবাক হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ব'লে, যেন আমার উপর যে-বিরাট আস্থা সে

রেখেছিলো, আমি তার অযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হচ্ছি। যদি আর-একটু কথা বলতে পারতাম, যদি হঠাৎ ঐ যান্ত্রিক গোলযোগ ঝাঁপিয়ে না-পড়তো আমাদের উপর, যদি প্রকৃতির খামখেয়াল আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে না-দিতো! কিন্তু ঐ কথাটা—'আমি তোমাকে সব সময় চিঠি লিখে চলেছি—মনে-মনে। সব কথা লেখা যায় না জানো তো।'—এর চেয়ে স্পষ্ট আর কী হ'তে পারে? সব কথা লেখা যায় না—যেহেতু বলার কথা অন্তহীন। আর তাছাড়া (সেটাই হয়তো আসল কারণ) ভাষার শক্তি আর কতটুকু? আঁটোসাঁটো, কষ্টকর পোশাক—তা কি শুধু কোনো বিদেশী ভাষা, যেমন আমার পক্ষে ইংরেজি, বা এষার পক্ষে রাশিয়ান? ভাষা ব্যাপারটাই কি সংকীর্ণ নয়, আনুমানিক নয়—আমরা যাকে মাতৃভাষা বলি, তাও? কোথাও স্বাচ্ছন্দ্য কম, কোথাও বা কিছুটা বেশি—এই যা তফাৎ। ধরা যাক কত কোটি-কোটি মানুষ ইংরেজি বলে, হিস্পানি বলে, বাংলা হিন্দি তামিল বলে—কিন্তু বলার মতো বলতে পারে ক-জন? বরং তাদেরই মুখে-মুখে ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে যাচ্ছে ভাষা, তাদেরই হাজার-হাজার খবর-কাগজে ময়লা হ'য়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে, ধ্বংসে পড়ছে বিশেষণ, প্রবাদ, রসিকতা, সদুক্তিগুলি ধরা বুলিতে পরিণত হচ্ছে।—যে-সব লেখা ভাষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ব'লে স্বীকৃত, তাতেও কি ধরা পড়ে না এখানে একটা মোটা ছুঁচের ফোঁড়, ওখানে এক টুকরো ঢিলে সুতো, আর কোথাও বা অর্ধেক-লুকোনো আলপিনের জোড়—শুধু ফাঁকে-ফাঁকে মণিমুক্তো ঝিলিক দেয় ব'লে সেগুলিকে আমরা লক্ষ্য করি না? মনের মধ্যে যা থাকে নিটোল ও উজ্জ্বল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু ভাষার ছাঁচে ফেলতে গেলেই তা কুঁকড়ে যায়, বা ফেঁপে ওঠে, ফেটে, ফেঁসে ঘনত্ব হারিয়ে হ'য়ে ওঠে একটি আপোশমাত্র—অমোঘ নয়, স্থান, কাল, অবস্থা অনুসারে আপেক্ষিক। হ্যাঁ—আপেক্ষিক, কেননা সময় অনবরত বদলে দিচ্ছে ভাষাকে—অমন জ্বলজ্যান্ত শেক্সপীয়র পড়ার জন্যেও টীকা না-হ'লে চলে না আজকাল, আঠারোশতকী বাংলা

গদ্য সাধারণ পাঠকের অবোধ্য। বা ধরা যাক চাটগাঁ ও বাঁকুড়ার দুই সমকালীন গ্রামীণ মানুষ—দুজনেই 'বাংলা' বলে,—কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভাষার সেতুবন্ধ প্রায় অসম্ভব। অনুবাদে কত বদলে যায় রচনা—যেতেই হবে, কেননা সব ভাষা সমানভাবে ভাগ্যবতী নয়, প্রত্যেক ভাষাতেই আছে এমন কোনো-কোনো ইঙ্গিত, শব্দবন্ধ, ছন্দস্পন্দ, আলো-আঁধারি, যা তারই পক্ষে অনন্য, দ্বিতীয় কোনো ভাষার পক্ষে যা নাগালের বাইরে। আর যাকে আমরা বলি মৌলিক রচনা, তাও তো অনুবাদ—চিন্তা থেকে ভাষায়, কল্পনা থেকে মূর্তে: সবচেয়ে দুরূহ ও কষ্টসাধ্য এই অনুবাদ—আর হয়তো সবচেয়ে কম সফল। কত ভালোই হ'তো, যদি আমরা পারতাম একই তাঁতে অনেকগুলো ভাষাকে বুনতে, যদি থাকতো এমন কোনো বকযন্ত্র, যাতে নানা ভিন্ন ভাষার ভিন্ন-ভিন্ন গুণপনাকে চোলাই ক'রে নিতে পারতাম। হয়তো অমনি ক'রেই গ'ড়ে উঠতে পারে—অমুক বা তমুক ভাষা নয়, শুধু ভাষা, মানুষের চিরকালের প্রতীক্ষিত সেই ভাষা, যাতে স-ব কথা বলা যায়। আর হয়তো তেমনি কিছু চেষ্টা করছে এষা—ছোটো মাপে, তার নিজের গরজে, চেয়েছে আমারই জন্য এক বিশেষ, গোপন, বহুমিশ্র, সাংকেতিক ভাষা তৈরি করতে, যা অন্য কেউ না-বুঝলেও আমি সহজেই যার তল খুঁজে পাবো—অন্তত সে তা-ই ধ'রে নিয়েছে—যেহেতু আমি ভাষাবিদ, আর যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি। তাহ'লে··· আমি প্রথমে যা ভেবে-ছিলাম তা-ই ঠিক!

—কিন্তু কী ক'রে হবে? এষা তো আমার মতো পুঁথি-খেকো মানুষ নয় (ভাগ্যিশ নয়!)—এ-রকম একটা কল্পনা তার মাথায় কী ক'রে আসবে? এই আপত্তি বিরূপাক্ষর মনে দ্বিতীয়বার ভেসে উঠলো, কিন্তু এবারে তিনি সচেতনভাবেই সরিয়ে দিলেন সেটাকে, এষার পক্ষে এই লিপি রচনা অসম্ভব, এ-রকম একটা প্রস্তাব এখন আর তাঁর বিবেচনার যোগ্য ব'লে তাঁর মনে হ'লো না। সমস্ত ব্যাপারটাকে এক ভিন্ন দিক

থেকে দেখতে পেলেন তিনি, নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন : এযার কতটুকু তুমি জানো, বলো তো ?—না, প্রতিবাদ কোরো না ; তোমাকে মানতে হবে তুমি অন্যভাবে ব্যস্ত ছিলে তাকে নিয়ে—সংকীর্ণ শরীর ও সময়ের মধ্যে হাঁপিয়ে-ওঠা সেই উপস্থিতি, দিনে-দিনে আসন্নতর বিদায়ের চাপে তীক্ষ্ণ-হ'য়ে-ওঠা দিনরাত্রিগুলি, তার বাইরে দূর-সন্ধানের সময় ছিলো না তোমার, ইচ্ছেও ছিলো না। বড়ো বেশি ব্যগ্র হাতে তুমি ধরতে চেয়েছিলে তাকে, বড়ো বেশি ধৈর্যহীনভাবে, তাই তোমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে খ'সে প'ড়ে গেছে, এযাকে ভাবলে এখন তোমার মনে পড়ে তার চোখের হাসি, চুলের গন্ধ, স্পর্শের কাঁপন—আর-কিছু নয়, শুধু সেইটুকুই। তোমাকে মানতে হবে তোমার এই ভালোবাসায় বেশি কিছু তুমি ধরাতে পারোনি, ছোটো খিদে নিয়ে শুধু কোণখামচি ভেঙে চেখেছিলে।

—কিন্তু সেই ত্রুটির সংশোধন হবে এবার। তারই উপায় এই চিঠি।

বিরূপাক্ষ আবার সংকেতময় কাগজটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ; টের পেলেন না, কখন কখন তাঁর মাথা এলিয়ে পড়লো চেয়ারের পিঠে, তাঁর সব ভাবনা ঝাপসা হ'তে-হ'তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। হঠাৎ এক সময় চমকে উঠে দেখলেন তিনি চেয়ারে ব'সে-ব'সে ঘুমুচ্ছিলেন, ঘাড়ে বড্ড ব্যথা হয়েছে, আর টেবল-ল্যাম্পের আলোকে বিবর্ণ ক'রে দিয়েছে মেরুন রঙের পর্দার আভায় লাল-হ'য়ে-ওঠা রোদ্দুর।

২

আমেরিকান এক্সপ্রেসে কোনো চিঠি পেলেন না সেদিন, পাবেন ব'লে আশাও করেননি। বেলা কাটালেন পথে-পথে ঘুরে—বিস্রস্ত, উদ্দেশ্য-হীন, এলোমেলো। অনেক গলি, অনেক পিয়াৎসা, অনেক মূর্তি প্রাসাদ গির্জে ফোয়ারা বাগান ; কিন্তু তাঁর অন্য সব কৌতূহল আজ মৃত, তাঁর

চোখে অন্য কিছুর জন্য দৃষ্টি নেই। তিনি রোমে আছেন, এই চিন্তা আজ আর তাঁকে বিব্রত করলো না; মনেও পড়লো না প্লেনে আসতে-আসতে ভেবেছিলেন যে পিয়াৎসা নাভোনায় বের্নিনি রচিত চার-নদীর মূর্তি তাঁকে দেখতেই হবে (কেননা তার অন্যতম নদী গঙ্গা); এমনকি, ছেলেবেলায় পড়া যে-দুই কবির অনেক লাইন এখনো তাঁর ভাষাতত্ত্বের চাপে পিষ্ট হ'য়ে যায়নি, তাঁদের কবর বা স্মৃতিসদন দেখার জন্যও কোনো আগ্রহ তিনি অনুভব করলেন না। অন্য কাজ, বিশেষ একটি কাজ যেন গ্রেপ্তার ক'রে নিয়েছে তাঁকে, তা সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত তাঁর ছুটি নেই।

অগস্ট মাস, বেলা বাড়তে-বাড়তে রোদ্দুর কড়া হ'য়ে উঠলো, দেড়টা নাগাদ আশ্রয় নিলেন একটা কাফেতে। প্রথমে প্রচুর বরফের সঙ্গে এক গ্লাশ কাম্পারি, শুকনো গলা ভিজিয়ে নিয়ে হেঁয়ালিটি বের ক'রে খুলে ধরলেন—আজকের দিনে এই প্রথমবার। হঠাৎ একটা অঘটন ঘটলো। চোখ ফেলা মাত্র তিনটে শব্দে লাফিয়ে উঠে বিঁধলো তাঁর মগজে: গথিক অক্ষরে লেখা 'ফের্ন' (জর্মানে 'দূর'), পরের লাইনে গ্রীক 'অয়কস' ('বাড়ি'), আর তারই কয়েকটা শব্দ পরে রুশী হরফে 'আলো'—নিশ্চয়ই বাংলা কথাটা?...এত সহজ! প্রায় শব্দ ক'রে হেসে উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু গবেষণার কঠিন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ব'লে তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে সতর্ক হলেন।...কোথায় লুকিয়ে আছে ক্রিয়াপদ? অব্যয় কোনগুলো হ'তে পারে? কোন ধরনের ব্যাকরণ এই বিচিত্র লিপির যোগসূত্র? কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না, একটি পুরো বাক্য ধরা দিচ্ছে না এখনো।...তবু, একটা আরম্ভ করা গেছে, দেয়ালে তিনটে ছোট্ট ফুটো পাওয়া গেলো, যেন সূর্য ওঠার আগেকার ভোর, এর পরেই আলোয় আকাশ ভ'রে যাবে। তিনটে আবিষ্কৃত শব্দের মধ্যে একটা যে 'আলো', এটাও একটা শুভলক্ষণ ব'লে মনে হ'লো তাঁর; 'দূর', 'বাড়ি', 'আলো'—হয়তো লিখেছে, 'ঐ দূর বাড়িতে

আমার জন্য আলো জ্বলছে'—অর্থাৎ, 'আমি তোমার অভাবে কষ্ট পাচ্ছি।'…কিন্তু 'আমি ঐ দূরের আলো থেকে বাড়ি ফিরতে চাই—' এও তো হ'তে পারে। তাহ'লে তো অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত ভিন্ন-ভিন্ন বাক্যে ঐ তিনটে শব্দ স্থান পেতে পারে—তার মধ্যে কোনটা? তাছাড়া, ঐ তিনটে শব্দ যে একই বাক্যের অন্তর্ভূত, তারই বা নিশ্চয়তা কী? যতিচিহ্নগুলি অস্পষ্ট; আব গ্রীক, গথিক, রুশী হরফ হাতের লেখায় দেখে তো অভ্যেস নেই আমার, বাঙালি শিশু যেমন যুক্তবর্ণ গুলিয়ে ফ্যালে, তেমনি আমার ভুল হচ্ছে না তো? যদি কোনো সাহায্য পেতাম, যদি বহু ভাষার অভিধান থাকতো হাতের কাছে, দু-একজন মহাবিদ্বান পুরুষ…এই রোমে কি আছেন কেউ? তাঁর মনে পড়লো এনরিকো কার্ত্চির নাম—ইতালির শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী, কিন্তু তাঁর গবেষণার জগৎ মঙ্গোলীয়, আমার সমস্যাটি ঠিক তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ে না।…আমি কি চ'লে যাবো জেনিভায়, যেখানে আছেন শার্ল দুবোয়া, যিনি দশ খণ্ডে প্রাচীন ইন্দো-য়োরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক অভিধান প্রণয়ন ক'রে এক বিরাট কীর্তি স্থাপন করেছেন? ধারণাটি নিয়ে মনে-মনে খেলা করলেন বিরূপাক্ষ—এই কয়েকমাস আগে দুবোয়ার সঙ্গে দেখা হ'লো ন্যুয়র্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, 'উত্তর-ভারতীয় ভাষাসমূহে আনুনাসিক শব্দের বিবর্তন' বিষয়ে আমার এক ক্ষুদ্র নিবন্ধেব তিনি সমর্থন করলেন—তিনি আমাকে বিমুখ করবেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু—কী বলবো গিয়ে? এই চিঠি—নিতান্ত ব্যক্তিগত, গোপন—তা কি অন্য কাউকে দেখানো সম্ভব? …তা, আমি তো কৌতুকেব ভান ক'রে বলতে পারি—'আমাব এক মার্কিনী ছাত্রী একটা হেঁয়ালি বানিয়ে পাঠিয়েছে আমাকে—দেখুন তো এটার কোনো অর্থ হয় কিনা, না কি বিলকুল বুজরুকি?'…আর তাছাড়া, পণ্ডিতের কাছে সবই জ্ঞানের বিষয়, আর জ্ঞান কখনো ব্যক্তিগত হয় না; যে-মন নিয়ে শল্য-চিকিৎসক সংবিৎহীন নগ্নীকৃত সুন্দরীর উদরে অস্ত্র চালান, সেই মন

নিয়েই এই চিঠিটাকে বিশ্লেষণ করবেন শার্ল দুবোয়া-র মতো বা ট্যুবিঙ্গেনের য়োআকিম ৎসিন্‌-এর মতো কোনো জ্ঞানীজন। আরো কথা এই যে তাঁদের দক্ষতার শলাকায় উদ্‌ঘাটিত হবে শুধু আক্ষরিক অর্থ, কিন্তু নিহিত বার্তা আমারই জন্য কুমারী থাকবে। যত ভাবলেন, ততই বিরূপাক্ষর মন এই প্রস্তাবের দিকে উৎসুক হ'য়ে উঠলো, মনে হ'লো দেশে ফেরার আগে, যে ক'রে হোক, এই সারা-মন-জোড়া অশান্তির ভার তাঁকে নামাতেই হবে। কোনো বাধা নেই, তাঁর ছুটি এখনো ফুরোযনি, ফিরতি-টিকিটের মেয়াদ আরো তিন সপ্তাহ, হাতে কিছু টাকাও আছে। তিনি কয়েকটা দিন দেরি ক'রে দেশে ফিরলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

রাভিয়োলির প্লেট অর্ধভুক্ত রেখে উঠে পড়লেন, ট্যাক্সি নিয়ে এলেন তাঁর প্লেন-কোম্পানির আপিশে, কালকের যাত্রা বাতিল ক'রে, কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠিয়ে, সন্ধের পর জেনিভার ট্রেন ধরলেন।

কিন্তু শার্ল দুবোয়া অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে। ট্যুবিঙ্গেনে এসে শুনলেন, যোআকিম ৎসিন্ গ্রীষ্মের ছুটিতে পর্তুগালে বেড়াতে গেছেন। ট্যুবিঙ্গেন থেকে হাম্বুর্গ, সেখানে তিনি অধ্যাপক হেলমুট শ্লেল-এর খোঁজ করাতে সকলেই অবাক হ'লো, কেননা সেই অশীতিপর পণ্ডিত বছরখানেক আগে কবরস্থ হয়েছেন। এলেন প্যারিসে, কিন্তু সর্বনের আঁরি প্যের তখন কুইবেক্‌-এ, অক্টোবরের আগে ফিরবেন না। মুহূর্তের জন্য নৈরাশ্যে নুয়ে পড়লেন বিরূপাক্ষ, মনে হ'লো দুর্ভাগ্য তাঁকে পদে-পদে হানা দিচ্ছে, হয়তো এই অশান্তির বোঝা নিয়েই তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হবে।

য়োরোপে তাঁর শেষ রাত্রিটি কাটলো প্যারিসের বাম তীরে এক শস্তা হোটেলে। শুতে যাবার আগে তাঁর অবশিষ্ট বিদেশী টাকা গুনলেন তিনি—থার্ড ক্লাশ ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন এ-ক'দিন, পারতপক্ষে ট্যাক্সি

নেননি, কম ক'রে খেয়েছেন, সম্ভব হ'লেই রাত্রিগুলি ভ্রমণে কাটিয়েছেন —হোটেলের বিল্ বাঁচাবার জন্য—কিন্তু তবু যা খরচ হ'য়ে গেলো তা ভারতীয় মাপে তুচ্ছ নয়। ভালো স্বামী তিনি, ভালো পিতা, কর্তব্য-পরায়ণ, মার্কিন দেশে অধ্যাপনার আয় থেকে যা বাঁচাতে পেরেছিলেন তা নিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের' জন্য—সে-টাকাটা তিনি নিজের ব'লে মনেই করেন না ; তাই এই শেষ দফায় খামখেয়ালি আন্দাজি ব্যয়ের জন্য ঈষৎ অনুশোচনা হ'লো তাঁর। তাও তো সব নিষ্ফল হ'লো। হয়তো এই চিঠি, বা হেঁয়ালি, বা পরিহাস, বা যা-ই হোক—হয়তো এই ব্যাপারটা আমার ভুলে যাওয়াই উচিত, আমার কি জীবনে আর কাজ নেই যে এ-রকম একটা ছেলেখেলা নিয়ে সময় কাটাবো ?

বিছানায় শুয়ে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুললো। এই যে এত ঘোরাঘুরি ক'রেও কোনো সাহায্যকারীর দেখা পেলেন না, তাও হয়তো অভিপ্রেত, পরিকল্পিত ; সে চায় না আমি অন্য কারো সাহায্য নিই ; এই পরীক্ষায় আমি বিশুদ্ধ-ভাবে নিজের চেষ্টায় উত্তীর্ণ হবো, এই তার দাবি আমার উপর। কথাটা মনে হওয়ামাত্র একটা সুখের ঢেউ ব'য়ে গেল তাঁর বুকের তলায়, আরো নিবিড় হ'য়ে ঘুম নামলো চোখে, মনে হ'লো এই জটিল খেলার মূলসূত্রটি তিনি ধরতে পেরেছেন। আস্তে-আস্তে তাঁর চোখে ঘুম নামলো।

জেগে উঠে দেখলেন তখনও আলো ফোটেনি। তাঁর প্লেন ছাড়বে দশটায়, সময় আছে। মাত্র ঘণ্টাতিনেক ঘুমিয়েছেন—তবু বেশ হালকা লাগছে, ঘোরাঘুরির ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই। আলো জেলে আবার বসলেন সেই কাগজখানা নিয়ে ; দু-ঘণ্টা পরে একটি অনুমানে পৌঁছলেন। চিঠির প্রথম তিনটি শব্দ মধ্যযুগীয় লাতিন অপভাষায় লেখা, তার অর্থ খুব সম্ভব—'তুমি চ'লে যাবার পর ··'

৩

নির্দিষ্ট তারিখের দশ দিন পরে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়, নির্দিষ্ট চাকরিতে যোগ দিলেন আবার, কাঁধে তুলে নিলেন নির্দিষ্ট সব দায়িত্ব। টাকা যা বাঁচিয়ে আনতে পেরেছিলেন তা দিয়ে পৈতৃক বাড়িটির সংস্কার করালেন, স্ত্রীকে কিনে দিলেন রেফ্রিজরেটর, রেডিওগ্রাম, নতুন আসবাব-পত্র; আবার ঢুকে গেলেন তাঁর অভ্যস্ত, পুরোনো জীবনের বৃত্তের মধ্যে—অতি সহজে, বিনা প্রতিরোধে।

পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তিনি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এমন কয়েকটি ক্ষীণকায় গবেষণা প্রকাশ করলেন, যা নিয়ে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ মহলে সজীব আগ্রহ উদ্রিক্ত হ'লো। কিন্তু বিদেশে যা স্বাভাবিকভাবেই শুধু বিশেষজ্ঞদের আলোচ্য, স্বদেশে তা-ই বিস্ময়করভাবে রেখাপাত করলো লোকমানসে। বলা বাহুল্য, তিব্বতি ভাষার ধাতুরূপে সংস্কৃতের প্রভাব কতটুকু, কোন-কোন হিব্রু ও গ্রীক শব্দ প্রাচীন পারসিক থেকে আহৃত, তাগালগ ভাষা কতদূর পর্যন্ত তামিল ও সিংহলির আত্মীয়, এবং তাতে পালি ও মাগধী-প্রাকৃতের মিশ্রণই বা কতখানি—এ-সব প্রশ্ন মানুষের দৈনিক জীবনের পক্ষে সর্বত্রই সমানভাবে অবান্তর; কিন্তু যেহেতু অবোধ্য বস্তুও উত্তেজনার খোরাক জোগাতে পারে, আর যেহেতু দেশপ্রেমের প্ররোচনায়, এবং নিজেদের তুচ্ছতার ক্ষতিপূরণরূপেও, আমরা ভারতীয়রা কোনো অনুমিত প্রতিভাবানকেও অতীকৃত ক'রে দেখতে ভালোবাসি, তাই একদিন—অক্সফোর্ড, ইংলণ্ডের 'দি ফিললজিস্ট' আর কেম্ব্রিজ, ম্যাস্-এর 'জর্নাল অব লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ়'-এ প্রকাশিত দুটো দীর্ঘ ও সপ্রশংস আলোচনা দৈবাৎ জানাজানি হ'য়ে যাবার ফলে—একদিন কলকাতার একটি বহুল-প্রচারিত দৈনিকপত্রে বিরূপাক্ষ রায়কে নিয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হ'লো, ধুয়ো ধ'রে অন্যান্য কাগজেও লেখালেখি হ'লো অনেক—'বাগীশ্বর', 'ক্ষণজন্মা গীষ্পতি', 'বিশ-শতকী মিথিড্রাতিস'—এই সব পুষ্পল অভিধা তাঁকে অর্পণ করলো

সাংবাদিকেরা, এক নিরীহদর্শন কিন্তু চতুর যুবক কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে পাঠরত অবস্থায় তাঁর ছবি তুলে নিয়ে ছাপিয়ে দিলো বম্বাইয়ের এক সচিত্র ইংরেজি সাপ্তাহিকে। এর পর ব্যাপারটি ক্রমশ ঘোরালো হ'য়ে উঠতে লাগলো, দিল্লির দেবতারা অকস্মাৎ তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে সচেতন হ'য়ে তাঁর উপর অর্পণ করলেন পদ্মবিভূষণ উপাধি; আর তার পরের বছর পশ্চিমবঙ্গীয় কর্ণধারগণ, গুণগ্রাহিতায় দিল্লির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, তাঁকে উপঢৌকন দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মান-পদবি, যা সাধারণত শুধু মৃতপ্রায় মহাস্থবিরদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

এই অপ্রত্যাশিত ও তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ঘটনাগুলোতে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন বিরূপাক্ষ। বাড়িতে ও কর্মস্থলে রবাহূত সমাজব্রতী ভদ্রমহোদয়গণ; পত্রে ও টেলিফোনে বহু অপরিচিত ব্যক্তির ও কখনো বা কোনো খ্যাতনামার অনুরোধ, কোনো-না-কোনো পত্রিকার তরফ থেকে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রার্থনা; তাঁকে বলা হচ্ছে বহুবিধ আন্দোলনে অংশ নিতে, বহুবিধ সংস্থার সভাপতি, উপসভাপতি বা উপদেষ্টা হতে, বহুবিধ ইস্তাহারে স্বাক্ষর ও বহুবিধ সভামণ্ডপে ভাষণ দিতে; সুয়েজ-সংকট, মহাবিশ্ব-অভিযান, চীন-ভারত সম্পর্ক, শিল্পীর স্বাধীনতা, এমনকি একটি পরিকল্পিত কালীমন্দিরের স্থাপত্য, এমনকি ভারতীয় ফিল্মে চুম্বন-প্রদর্শনের যৌক্তিকতা—এই ধরনের বহুবিধ বিচিত্র বিষয়ে তাঁর মতামত চাওয়া হচ্ছে দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। ভারতের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে তাঁকে টেনে আনার চেষ্টা হ'লো কিছুদিন; উত্তরভারতীয়রা ধ'রে নিলো তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ব'লেই হিন্দির সমর্থক হবেন, আর দক্ষিণ-ভারতীয়রা আশান্বিত হ'লো এই ভেবে যে কোনো বাঙালি কখনো হিন্দি-বিরোধী না-হ'য়ে পারে না; ফলত, দু-দিক থেকেই প্রচুর চাটুবাক্য তাঁর উপর বর্ষিত হ'তে লাগলো। আসছে তাঁর নামে পাঁচটা বৈদেশিক দূতাবাস থেকে

নিমন্ত্রণ ; দিল্লি, বম্বাই, জলন্ধর, এর্নাকুলম থেকে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আহ্বান ; পূর্ব য়োরোপে বা পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-সরকার কর্তৃক প্রেরিতব্য কোনো সাংস্কৃতিক দৌত্যের নেতা হবার জন্য অনুরোধ। কেমন ক'রে তিনি সামলে উঠবেন এ-সব, কী করবেন এগুলোকে নিয়ে? প্রথম ধাক্কায় অসহায় বোধ করলেন বিরূপাক্ষ—উদ্‌ভ্রান্ত, বিপন্ন, অসহায়, আর সেইজন্যই, যেন টাল সামলাতে না পেরে, এমন দু-একটা কাজ ক'রে ফেললেন যা তাঁর পক্ষে অনুচিত ও অনুপকারী। স্বাক্ষর দিলেন দু-একটা বিবৃতিতে ('শুধু আগন্তুকদের সত্বর বিদায় দেবার জন্য, তাতে কী লেখা আছে তা ভালো ক'রে না-প'ড়েই); বহুসংখ্যকের উপরোধে (কেননা অনবরত অসম্মতি জানাতে হ'লে বড়ো বেশি বলক্ষয় হয়) গতানুগতিক বক্তৃতা করলেন কোনো-কোনো সভায় ;—কিন্তু এরই মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনার ফলে তিনি আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হলেন। একদিন তাঁর এক সহকর্মী (বয়সে তাঁর চেয়েও বড়ো) তাঁকে বললেন, 'একটা কথা বলি বিরূপাক্ষবাবু, আপনি এখন কর্তাদের নেকনজরে আছেন—এই মওকায় একটা মোটা গ্র্যাণ্ট আদায় করে নিন না "বাক্" পত্রিকার জন্য, চাইকি একটু চেষ্টা করলে আমাদের ভাষাবিজ্ঞান-পরিষদের জন্য এক খণ্ড জমিও বাগাতে পারেন।' 'নেকনজর', 'মওকা', 'আদায়', 'বাগানো'—এক-একটা কথায় যেন বিরূপাক্ষর যেন অন্ত্রতন্ত্র কাৎরে উঠলো, কিন্তু ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করলেন তাঁর প্রবীণ সহকর্মীটি, আর এমন সুরে, চোখের এমন ভঙ্গিসহযোগে, যেন এই পরামর্শমতো কাজ না-করা বিরূপাক্ষর পক্ষে মূঢ়তা হবে। আর বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন এ-অবস্থায় তাঁর কর্তব্য কী ; বুঝে নিলেন তাঁর বাঁচার একমাত্র উপায় হ'লো সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, দুর্বল পোকার মতো গর্তে লুকোতে হবে তাঁকে, প্রায়-নিশ্চল শামুকের মতো বর্ম রচনা করতে হবে নিজেকে ঘিরে। এর পর থেকেই তিনি নির্বিচারে প্রত্যাখ্যান করতে লাগলেন প্রতিটি প্রস্তাব—

মৃদুভাবে, দৃঢ়ভাবে, সবিনয়ে, কখনো কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাবেও, কখনো কোনো রাজমন্ত্রী বা লোকনায়কের অসন্তোষ উৎপাদন ক'রেও। সেই উগ্র বিজ্ঞাপনের আলো, যা অকস্মাৎ পড়েছিলো তাঁর মুখের উপর, তা সাবলীলভাবে অন্যদিকে স'রে গেলো, কোনো সভায় কেউ বিরূপাক্ষ রায়কে দেখতে পায় না, দিল্লিতে বা কলকাতায় কোনো সমিতির তিনি সদস্য নন, সব রকম তাৎকালিক বিষয়ে নীরব থাকেন ব'লে তাঁব নাম কখনো কাগজে-পত্রে দেখা যায় না। এই সমাজবিমুখতার জন্য কোনো-কোনো মহলে কিছুদিন পর্যন্ত নিন্দিত হলেন তিনি; কিন্তু যেহেতু পদের তুলনায় পদপ্রার্থীর সংখ্যা সর্বদাই অনেক বেশি, তাই তাঁর অভাব কোথাও অনুভূত হ'লো না (কেউ-কেউ তাঁর অপসারণে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন); প্রভাবশালী পুরুষেরা বর্জন করলেন তাঁকে, জনসাধারণ তাঁর নাম ভুলে গেলো; বিরূপাক্ষ আপৎমুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পারিবারিক জীবনেও কিছু পরিবর্তন ঘটলো। মেয়ে বিয়ে করলো তার স্বনির্বাচিত এক তরুণ চিত্রকরকে; সরকারি ভূতত্ত্ব-বিভাগে চাকরি নিয়ে ছেলে চ'লে গেলো রাঁচিতে; আর তাঁর স্ত্রী সুহাসিনী এক সুখী ও স্বতন্ত্র জীবনধারা গ'ড়ে তুললেন। যৌবনের প্রথম ঝাপট কেটে যাবার পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে বিরূপাক্ষর সম্বন্ধ ধীরে-ধীরে শিথিল হ'য়ে আসছিলো—হয়তো তার কারণ ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর অত্যধিক আসক্তি, বা স্ত্রীর দিক থেকে কোনো অচেতন বিমুখতা; বহু বছর ধ'রেই (এষার সঙ্গে সংযোগের কয়েকটা সপ্তাহ বাদ দিয়ে) তাঁর জীবন নারীসম্পর্করহিত, আর সেটাই তাঁর অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে। তাই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন না যখন, তিনি বিদেশ থেকে ফেরার স্বল্পকাল পরেই, কিছুটা অকালে, তাঁর স্ত্রী প্রাকৃতিক নিয়মে কন্দর্পসেবার ভার থেকে মুক্তি পেলেন। আর এখন, বাড়িতে যখন বলতে গেলে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাসিন্দা নেই, তখন দু-জনে হ'য়ে উঠলেন পরস্পরের পক্ষে সুদূর, প্রায় যোগসূত্রহীন। কন্যার (বা কন্যার মধ্যস্থতায় জামাতার) প্রভাবে,

সুহাসিনী নিজেকে চিত্রকলার রসজ্ঞ ব'লে ভাবতে শিখলেন; তাদের সঙ্গে নানা প্রদর্শনীতে যাচ্ছেন তিনি, তরুণ শিল্পীদের বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করছেন। তাছাড়া তাঁকে কিছুটা ব্যস্ত রাখে তাঁর দক্ষিণ-কলকাতা মহিলা-সংসদ, যার কর্মসচিবরূপে তিনি স্বাধীনতা-দিবস ও প্রজাতন্ত্র-দিবসে রাজভবনে নিমন্ত্রিত হন, নারী-কল্যাণসম্পৃক্ত বিষয়ে মাঝে-মাঝে আলোচনা করেন আকাশ-বাণীতে। আর আছে বছরে দু-বার ছেলের কাছে বেড়াতে যাওয়া, মানভূম-ছোটোনাগপুর অঞ্চলে রমণীয় পার্বত্যভূমিতে মোটরভ্রমণ, নাতি-নাৎনির সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপনের অনাবিল আনন্দ। এবং যেহেতু এর কোনোটাতেই বিরূপাক্ষ কোনো অংশ নেন না, তাই—শুধু স্ত্রীর সঙ্গে নয়, পুরো পরিবারের সঙ্গেই তাঁর ব্যবধান ক্রমে বেড়েই চললো।

এ নিয়ে প্রথম-প্রথম ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়নি তা নয়। মেয়ের নতুন বিয়ের পর সুহাসিনীর মুখে এই অভিযোগটি প্রখর হ'য়ে উঠেছিলো যে বিরূপাক্ষর মতো একজন বিদ্বান মানুষ, যাঁর মতামতের কিছু মূল্য আছে ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, তিনি অসিত সামন্তর ছবি বিষয়ে একেবারে নীরব। 'নিজের জামাই ব'লে বলছি না, কিন্তু সত্যিই তো ওর ছবি খুব ভালো—অসাধারণ!' এখন বিরূপাক্ষ ছবি বলতে বোঝেন এমন জিনিশ, যাতে চিত্রিত বিষয়গুলিকে স্পষ্টভাবে চেনা যায়, তাকানোমাত্র ধরা পড়ে জল, পাহাড়, জন্তু, মানুষ, দেবদেবী ইত্যাদি, সব মিলিয়ে একটা দৃশ্যমান কাহিনীর মতো যেন—যার কিছু-কিছু নমুনা সেবার বিদেশে দেখে তাঁর অবস্থা হয়েছিলো ময়-নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের মতো—ছবিতে আঁকা আহত সৈনিকের বুক থেকে গড়িয়ে-পড়া টাটকা লাল রক্তের ফোঁটা মুছে দেবার জন্য প্রায় রুমাল বের করেছিলেন, ঐ উজ্জ্বল রৌদ্রের ঝলক যে প্রাকৃত বস্তু নয়, একটি পটের উপর বর্ণলেপনের ফলাফল মাত্র, তা বুঝে নিতে একটু সময় লেগেছিলো। অবশ্য মোগল বা রাজপুত ছবিতে রাধার অভিসার বা দোলখেলাও তাঁর মন্দ লাগে না,

মানুষগুলো পুতুলের মতো হ'লেও দেখামাত্রই বোঝা যায় ব্যাপারটা কী—কিন্তু অসিতের হাতের কাজ, তাঁর মনে হয়, কোনো শিশুরও হ'তে পারতো : ভাঙাচোরা, আঁকাবাঁকা লাইন, আবোলতাবোল রঙের ছোপ, মোটের উপর আমাদের চেনা ' কোনো-কিছুর মতো নয়—এমনকি এটুকু পর্যন্ত মালুম হয় না যে ছবিটা মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে কি নেই। তাঁর বুদ্ধি তাঁকে জপায় যে এটাই হয়তো নতুন কায়দা (কেননা এ-ধরনের কিছু নমুনা তিনি বিদেশেও সেবার দেখেছিলেন)—কিন্তু সে যা-ই হোক, এ-সবে কিছু এসে যায় না তাঁর, তাঁর জীবন থেকে এগুলো শতযোজন দূরে। সেজন্যই নীরব থাকেন তিনি ; পাছে তাঁর স্ত্রী, বা কন্যা, বা স্বয়ং শিল্পী-জামাতা ও-সব ছবির রহস্য তাঁকে বোঝাতে শুরু করে, সেই আশঙ্কায় মনের ভাবটি খুলেও বলেন না। এই সময়ে মাঝে-মাঝে সুহাসিনীর সঙ্গে তাঁর এই ধরনের নিভৃত সংলাপ চলতো :

'শনিবার অসিতের এগজিবিশন খুলবে আর্ট-সেণ্টারে। তুমি আসছো তো ?'

'দেখি।'

'এর মধ্যে আবার দেখাদেখির কী আছে। এই প্রথম অসিতের একলার এগজিবিশন হচ্ছে—আর তুমি আসবে না, তা কী হয় !'

'আমি ছবির কিছু বুঝি না।'

'ছবি তো বোঝার জিনিশ নয়, দেখার জিনিশ।' (একটু আত্মসচেতনভাবে কথাটা বলেন সুহাসিনী, আর বিরূপাক্ষ মনে-মনে বলেন, 'খুকুর কথা, খুকু অসিতের মুখে রোজ শোনে, আর অসিত হয়তো কোনো বইতে পড়েছিলো কখনো।')

'আমি—মানে—আমি ব্যস্ত থাকি তো।'

'ব্যস্ত তো সবাই থাকে। তাই ব'লে কি আর-কিছু করে না ?'

'বেশ, যাবো।'

'তোমার কোনো উৎসাহ নেই কেন, বলো তো? এ-সপ্তাহের "অভিযান"-এ অসিতের কথা কী লিখেছে, জানো?'

'কী?'

'লিখেছে—"নক্ষত্রলোক" ছবিটির জন্য অসিত সামন্তকে আমরা সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই।'

'বাঃ!'

'একদিন অসিতের ফাইলটা তোমাকে দেখতে দেবো।'

'ফাইল? ফাইল কিসের?'

'যেখানে যা রিভিয়্যু বেরোয় তার কাটিং আরকি। দেখবে, কত লোক কত ভালো কথা বলেছে।'

বিরূপাক্ষ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'শনিবারের এগজ়িবিশনে লেডি প্রমীলা চ্যাটার্জি আসছেন। উদ্বোধন করবেন—কে বলো তো?—শঙ্করানন্দ সিংহরায়!'

নামটা অস্পষ্টভাবে চেনা মনে হয় বিরূপাক্ষর।

'ভেবে দ্যাখো, অত বড়ো একজন ফিল্ম-ডিরেক্টর, দেশে-বিদেশে কত নাম—তিনি উদ্বোধন করবেন! অসিতের ইচ্ছে ফিল্ম-লাইনে কিছু কাজ করে—এই পোড়া দেশে ছবির তো বিক্রি নেই, কিন্তু ফিল্মে পয়সা আছে—শঙ্করানন্দর পরের প্রোডাকশনে অসিত যদি আর্ট-ডিরেক্টর হ'তে পারে—'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' সুহাসিনীর কথায় বাধা দিয়ে বিরূপাক্ষ ব'লে ওঠেন, 'সে তো খুব ভালো কথা।'

'বাইরে এত প্রশংসা—আর তুমি ঘরের লোক হ'য়ে কিছু বলো না, এটা কি ভালো দেখাচ্ছে?'

'কী বলতে বলো আমাকে?'

'তুমি কী বলবে তাও আমি ব'লে দেবো!' সুহাসিনী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন এবার। 'তোমার নিজের মেয়ে-জামাই—তাদের জন্য কি এতটুকু দরদ

নেই তোমার ! শুধু তো শ্বশুর নও—দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য মানুষ তুমি—তোমার কাছে উৎসাহ পেলে অসিতের কত আনন্দ হবে বোঝো না ?'

এর পর সুহাসিনী আরো কিছুক্ষণ ধ'রে খেদোক্তি ক'রে চলেন, বিরূপাক্ষ রা কাড়েন না ।

কিংবা—কয়েক বছর পরে :

'তুমি তাহ'লে যাচ্ছো না ?'

'বলেছি তো—'

'লীলা এতবার ক'রে বলেছে তোমাকে, চিঠিতে লিখেছে—'

'আমার কাজ আছে এখানে ।'

'বেশ তো । তোমার বইপত্র নিয়েই চলো । মস্ত বাংলো পেয়েছে দেবু—এখানকার মতোই আলাদা ঘরে থাকবে, কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না ।'

একটু ভেবে বিরূপাক্ষ জবাব দেন, 'কিন্তু কখন কোন বইটার দরকার হবে তা কি আগে থেকে বলা যায় ?'

'ওদের একবার দেখতেও ইচ্ছে করে না তোমার ?'

'বাঃ, দেখা তো হয় । ওরা তো আসে মাঝে-মাঝে ।'

'ওদের আসা, আর তোমার যাওয়া—এ-দুটো কি এক হ'লো ? তুমি গেলে ওরা কত খুশি হবে ভাবো তো ! দিনে-দিনে কেমন অদ্ভুত হ'য়ে যাচ্ছো তুমি—একটা ফুটফুটে ছোট্ট নাৎনি, তাকে এ-পর্যন্ত একবার কোলে নিয়েও তো দেখলে না !'

'তাকে কোলে নেবার লোকের তো অভাব নেই,' অন্যমনস্কভাবে একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফ্যালেন বিরূপাক্ষ ।

দুই ঘূর্ণিত চোখে তিরস্কার ছিটিয়ে সুহাসিনী চাপা গলায় ব'লে ওঠেন, 'আশ্চর্য ! তুমি কি একটা মানুষ !'

কিন্তু এই ধরনের বিতণ্ডাও এখন অতীতের কথা । তিনি স্বার্থপর,

তিনি আত্মকেন্দ্রিক, নিজের একটি অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে আছেন সব সময়, নিজের সন্তানের জন্যও কোনো মমত্ববোধ নেই তাঁর, নিজেকে ছাড়া কাউকে তিনি ভালোবাসেন না—এই সব কথা শুনে-শুনে অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন বিরূপাক্ষ, সুহাসিনীরও ব'লে-ব'লে ক্লান্তি এসে গেছে। বিরূপাক্ষ যে কোনো আমোদে-উৎসবে যোগ দেন না, নিকটতম আত্মীয়দের সন্তোষসাধনের জন্যও এক চুল স'রে আসেন না তাঁর নিয়মাবদ্ধ দিনযাপন থেকে—এঁ নিয়ে কোনো প্রতিবাদও আর ওঠে না আজকাল, কেউ কিছু আশা করে না তাঁর কাছে, সবাই তাঁকে মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে—তিনি যা, ঠিক তা-ই ব'লে, 'স্বামী' বা 'বাবা' বা 'দাদামশায়ে'র মার্কা-মারা একটি শূন্য হিশেবে, যেন তিনি এই বাড়িতে থেকেও নেই, যেন স্বাভাবিক স্নেহবৃত্তিতে আবদ্ধ হ'লেও তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোনো সংযোগ এখন সম্ভবপরতার পরপারে। সুহাসিনী মাঝে-মাঝে করুণার সুরে ছেলে-মেয়েকে বলেন, 'সারা জীবন মরা অক্ষর ঘেঁটে-ঘেঁটে মানুষটার মনই ম'রে গেছে—এ-রকম উনি ছিলেন না আগে, তোরা তো দেখেছিস—' আর অন্যেরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে দেয়, কেননা সকলেই জানে এ নিয়ে কথা ব'লে কোনো লাভ নেই।

৪

কিন্তু তবু, এতদূর পর্যন্ত নির্ভার ও বিচ্ছিন্ন হ'য়েও, এমন বিক্ষেপহীন অখণ্ড অবকাশ পেয়েও, বিরূপাক্ষ এই দশ বছরে তাঁর আসল কাজে প্রায় কিছুই এগোতে পারলেন না। অবিরাম শ্রম, ঋতুনিরপেক্ষ প্রয়াস—তা থেকে উদ্‌গত হয়েছিলো শুধু সেই তিনটি ক্ষুদ্র পুঁথি, যার বিপজ্জনক সাংসারিক পরিণাম থেকে তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন

নিজেকে। ওগুলো কিছু নয়—দু-একটি প্রাথমিক পল্লব শুধু, তাতে এমন কোনো নির্দেশ নেই যে গোল রক্তিম আপেলটিতে তিনি অবশেষে দাঁত বসাতে পারবেন। নিশ্চিতি—বহু দূরে; প্রমাণ—কিছুই নেই। সেই পত্রখানা এখনো তেমনি দুর্ভেদ্য হ'য়ে আছে, যেমন ছিলো দশ বছর আগে রোমে এক গ্রীষ্মের সকালে। সেটিকে ঘিরে-ঘিরে অনেক ঘুরেছেন তিনি; বেরিয়ে এসেছেন তাঁর 'ইন্দো-য়োরোপীয়' গণ্ডি ছেড়ে, কিছুটা হিব্রু আর চৈনিক শিখে নিয়েছেন, দিনের পর দিন ন্যুব্জপৃষ্ঠ হ'য়ে কাটিয়েছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে; বহু বই ঘেঁটে কয়েকটি লুপ্ত লিপির সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছেন; তাঁর নিজের অর্থাভাব (কেননা তাঁর ভাগ্য তাঁকে ধনের পথে পা বাড়াবার ক্ষমতা দেয়নি), ভারতে বিদেশী মুদ্রার অনটন, বিদেশী বইয়ের আমদানির হ্রস্বীকরণ—এই সব বাধা ডিঙিয়ে আনিয়েছেন লণ্ডন থেকে অনেকগুলি স্বল্পখ্যাত ভাষার অভিধান, অনেক রাত্রে তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমোননি; আর তবু, এই ব্যাসকূট এখনো ভেদ করতে পারলেন না।

অবশ্য অনেক আলোকবিন্দুও তিনি পেরিয়ে এসেছেন। অনেক মুহূর্ত, যখন প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের ক্ষণে অসতী স্ত্রীর ব্যগ্রতা নিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন কলম, লিখতে শুরু করেছেন যা সে-মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে ঐ পত্রের আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু প্রথম কয়েকটি বাক্য লেখার পরেই সংশয় তাঁকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে, পরবর্তী বাক্যটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন রন্ধ্রে লুকিয়ে আছে, আর তিনি কেমন ক'রে তার সন্ধান পাবেন—এই কুটিল ও অফুরান চিন্তায় তাঁর ধূসর মাথাটি নুয়ে পড়েছে টেবিলের উপর। দশ বছরে প্রায় সাড়ে-তিনশো টুকরো তিনি লিখে উঠেছেন, তাছাড়া অগুনতি টীকা-টিপ্পনী—শব্দার্থ, সম্ভবপর অন্বয়, সম্ভবপর ব্যাকরণের বিবিধ অনুপুঙ্খ—বারোখানা মোটা-খাতাভর্তি আঁকিবুঁকি হিজিবিজি লেখা, যার অর্থ তাঁর নিজেরই কাছে এখন

অস্পষ্ট—যতবার ভাবেন, এই বুঝি গুপ্ত চাবি হাতে এসে গেলো, ততবার সেই বিভ্রান্তি আরো বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণ—তাঁর অনুমিত বা কল্পিত অনুবাদগুলির বিষয়গত অনৌচিত্য ও অসংগতি, যাকে হাস্যকর বললে অত্যুক্তি হয় না। কোনোটায় যেন পাওয়া যায় সে-বছরের আসন্ন হৈমন্তিক ঋতুর মেয়েলি ফ্যাশানের বর্ণনা ('এবারে মেয়েদের ফ্যাশান লুঠ ক'রে নেবে তোমাদের দেশের চিতাবাঘ আর ময়ূর!'); কোনোটায় যেন রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করা হচ্ছে; আবার কোনোটাকে দেশান্তরগামী পাখিদের বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের আরম্ভ ব'লে মনে হয়। কোনোটায় ধরা পড়ে অবিশ্বাস্য অশ্লীলতা, আবার কোনোটা যেন রবিবারে কোনো মেথডিস্ট পাদ্রির সাংসারিক সদুপদেশ। স্পষ্টত, এর একটাও তাঁর অন্বিষ্ট বার্তা হ'তে পারে না; স্পষ্টত, প্রত্যেকটাই ভুল। দূরত্বের একটি সূক্ষ্মতম অংশও তিনি পেরোতে পারেননি এখনো।

ক্লান্তির মুহূর্তে কখনো তিনি ভেবেছেন এষাকেই লিখবেন এই রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে দিতে, কিন্তু নানা কারণে সেটা তাঁর যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়নি। প্রথমত, এষার নিজের কাছে এই বিচিত্র লিপির প্রতিলিপি নাও থাকতে পারে, আর চিঠিখানা তিনি মুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করতে নারাজ—নয়তো ব্লক করিয়ে যত ইচ্ছে ছাপা কপিও পেতে পারতেন। অবশ্য বিরূপাক্ষ তাঁর খাতার পাতায় প্রায় পঞ্চাশটি প্রতিলিপি এঁকে রেখেছেন—তাঁর যতদূর বিশ্বাস শেষ তিনটি একেবারে নিখুঁত, অতএব এষাকে একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেবার কোনো বাধাই ছিলো না। কিন্তু—অনেকদিন হ'য়ে গেলো, এমন যদি হয় এই হেঁয়ালির অর্থ এষা নিজেই এখন ভুলে গেছে? যদি এমন হয় সে নিজে ভুলে গেছে, এখন আমার কাছে জানতে চায় কী লিখেছিলো? খুব সম্ভব তা-ই, খুব সম্ভব তা-ই। রোজ ডাকবাক্স হাৎড়ে দ্যাখে এষা—সেই আশায়। মাঝে-মাঝে টেলিফোনের শব্দে চমকে ওঠে। 'আশ্চর্য! তুমি বুঝতে পারছো

না? তুমি!' কী অগাধ আস্থা আমার উপর, আমাকে অন্য কারো সাহায্য নিতে দেবে না, আমাকে সে ক'রে দিলো একেবারে নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। এখন যদি আমি তারই কাছে উত্তর জানতে চাই, তাহ'লে কি আমি অযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হবো না—শুধু অযোগ্য নয়, প্রতারক? পাশা খেলতে ব'সে যারা ঠকায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা বই থেকে টোকে, যারা চায় লটারির টিকিট কিনে রাতারাতি লক্ষপতি হ'তে—আমি তো, আর যা-ই হোক, তাদের দলভুক্ত নই। এত অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিরূপাক্ষর দুটি বিশ্বাস অটল থেকে যায়: (১) এই চিঠি এষার অনির্বাণ ভালোবাসারই নিদর্শন—তিনি যাতে না ভোলেন, যাতে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে না ভোলেন, সেইজন্যই এই কঠিন প্যাঁচে সে ফেলেছে তাঁকে, এবং অতএব (২) এর মর্মোদ্ধার একান্তভাবে তাঁরই কৃত্য, এবং তাঁর পক্ষে সম্ভব। কেমন অস্পষ্টভাবে কিন্তু দৃঢ়ভাবে তাঁর মনে হয় যে এই প্রতিজ্ঞায় যেহেতু তাঁকে বাঁধা হয়েছে, সেজন্যেই তা পালনের শক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত আছে ব'লে ধ'রে নিতে হবে। বাধা আর কিছুই নেই—এখনো যথেষ্ট মন দিতে পারছি না; বাইরের কারুকার্যে মুগ্ধ হ'য়ে বোধহয় পেটিকার ঢাকনা খুলতেই ভুলে যাচ্ছি।

এইজন্য, বেশ সুচিন্তিতভাবেই, অনেকবার লুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, বিরূপাক্ষ এষার সঙ্গে কোনোরকম যোগস্থাপন থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। অসম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে আর-একবার সেই দূর দেশে যাওয়া, যেখানে এক অখ্যাত শহরে এষাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। কোনো-এক সময়ে—যখন তাঁর উপর স্বদেশী সরকারের এবং বৈদেশিক দূতাবাসগুলির সুদৃষ্টি পড়েছিলো, সে-রকম একটা কথাও উঠেছিলো একবার; কিন্তু তিনি ইচ্ছে ক'রেই (বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে) সম্ভাবনাটিকে চাপা পড়তে দিয়েছিলেন। না—উচিত হবে না, যতদিন না তারই দেয়া এই কাজটুকু ক'রে উঠতে পারছি, ততদিন এষার সঙ্গে

আবার দেখা করার আমি অধিকারী নই। সে, আমার নম্র, মৃদুভাষিণী প্রেমিকা—সে ধৈর্যশীলভাবে অপেক্ষা ক'রে আছে আমার মুখে তার চিঠির অর্থ শোনার জন্য। সে যা ভুলে গেছে তা আমি তাকে মনে করিয়ে দেবো—এইজন্য তার অপেক্ষা। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

৫

কিন্তু কে এই এষা, যাকে বা যার স্মৃতিকে এই প্রৌঢ় পণ্ডিত উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন তাঁর সময়, স্বাস্থ্য, অভিনিবেশ? আর 'স্মৃতি', ঐ গুরুভার, রশ্মিচ্ছুরিত শব্দ, তারই বা অর্থ কী? তার নাম মনে-মনে বললে আর কি আমার নাড়ি চঞ্চল হয়? ঘুমের আগে বালিশে কান চেপে আর কি তার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই? স্পষ্টভাবে মনে পড়ে কি তার মুখ? যদি এমনকি সে হঠাৎ আমার দরজায় টোকা দেয় একদিন, আমি কি তাকে দেখামাত্র চিনতে পারবো? এই সব প্রশ্ন মাঝে-মাঝে ভেসে ওঠে তাঁর মনে, তিনি তক্ষুনি ঠেলে সরিয়ে দেন। আর এটাই হয়তো গভীরতর কারণ, যেজন্য কোনোরকম প্রত্যক্ষ যোগসাধনের চেষ্টা তিনি করেননি কখনো। পাছে দেখা হ'লে পুরোনো সুর ফিরে না আসে। পাছে খুচরো কথায় বেলা ব'য়ে যায়, যেন আমরা দু-জন অতি সাধারণ পরিচিত মাত্র। পাছে চিঠি লিখলে এমন উত্তর আসে, যা অন্য যে-কেউ লিখতে পারতো। না, ও-ভাবে নয়, কোনো সহজ পথে নয়—ও-পথে আমার গন্তব্যে আমি পৌঁছবো না। এষা কে, কী, কেমন, তাতে কী এসে যায়। কী এসে যায়, যদি সে আমার কাছ থেকে অপরিমেয় দূরে স'রে গিয়ে থাকে? আমি তো সেই দূরকেই ছুঁয়ে আছি, ঝর্না যেমন তার যাত্রার আরম্ভক্ষণেই ছুঁয়ে থাকে সমুদ্রকে,

তেমনি। চিঠি, এই চিঠি আছে আমার: তার চরম বার্তা,—তার নামাঙ্কিত সর্বশেষ উপহার—এ-ই যথেষ্ট। এমনি, পর-পর বছরগুলি যেমন কেটে গেছে, এমনি ভেবেছেন বিরূপাক্ষ, স্পষ্টত সচেতনভাবেও নয়। সত্যি বলতে, সময়ের ঢেউ লেগে-লেগে তথ্যগুলি সব ধ্ব'সে গিয়েছিলো—এমনকি এক-এক সময় মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার সেই ছোটো শহরটির নামও তিনি মনে করতে পারেন না; এথার বাড়ির নম্বর ছিলো ১৩০২ না ১২০৩, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হ'লে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া নোটবইয়ের পাতা ওল্টাতে হয়—কিন্তু এই ধারাবাহিক অবক্ষয়ের মধ্যে স্থির হ'য়ে আছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাঁর মনের মধ্যে অবিরতভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে—একটি ধারণা, তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু যেন—এই চিঠি, অক্ষর, সম্ভাব্য কোনো সমাচার।

এক-এক রাত্রে বিরূপাক্ষ তাঁর খাতাপত্র খুলে বসেন, তাঁরই কলমের আঁকিবুঁকিতে বিক্ষত পাতাগুলি ওল্টাতে-ওল্টাতে উৎসাহ আর নৈরাশ্যের দুই প্রান্তের মধ্যে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে তাঁর মন। মাঝে-মাঝে নুয়ে পড়েন রহস্যলিপিটির উপর, টেবল-ল্যাম্পের আলোর তলায় সেটিকে টান ক'রে ধ'রে, যেমন করেছিলেন প্রথম এটি হাতে পাবার পর রোমের হোটেলে, যেন আশা যে এখন-পর্যন্ত-অনাবিষ্কৃত কোনো নতুন অক্ষর ফুটে উঠবে হঠাৎ, বা দৃশ্যমান অক্ষরগুলির মধ্যে কোনো নতুন সম্বন্ধ ধরা পড়বে। নিশ্চয়ই কোনো নিয়ম লুকিয়ে আছে এর তলায়, কোনো গাণিতিক সূত্র—নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আসলে খুব সরল, যেমন একবার সংখ্যার বদলে চিহ্নকে কাজে লাগাতে পারলে অবশিষ্ট বীজগণিত নিজে থেকেই উন্মীলিত হয়, এও নিশ্চয়ই তেমনি। কিন্তু কেন আমি এত চেষ্টা করেও সেই মূলসূত্রটি খুঁজে পাচ্ছি না? বিরূপাক্ষ নিজের উপর বিরক্ত হন তাঁর টীকা-টিপ্পনীগুলি অমন বিশৃঙ্খল ব'লে, তাঁর যখন যা মনে এসেছে তা-ই লিখে রেখেছেন, কোনো আঁটো পদ্ধতি অনুসরণ করেননি—তাঁর কি উচিত ছিলো মার্কিনী প্রথায় কার্ড-ইনডেক্স

সাজানো, বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট তৈরি করা, এই চিঠির সঙ্গে আপাতত যা অসম্পৃক্ত, সেই তিব্বতি ও সিংহলি ভাষার চর্চা ক'রে তিনি কি তাঁর লক্ষ্য থেকে আরো দূরে এসেছেন? কিন্তু পদ্ধতি—তা-ই কি সব? আসল কথাটা কি দৃষ্টি নয়, দৃষ্টির ক্ষমতা যথোচিত হ'লেই কি সব রহস্য উন্মোচিত হয় না? কয়েক বছর আগে আমার ছোটো অক্ষর পড়তে কষ্ট হচ্ছিলো, ঝাপসা দেখতাম, চশমা নেয়ামাত্র সব পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। গ্যালিলিও তাঁর নিজের তৈরি দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে, তবে চাঁদের পাহাড় দেখতে পেলেন। রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে দেখা গেলো সজীব মানুষের কঙ্কাল, তার ফুশফুশ, হৃৎপিণ্ড। কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য রশ্মি, যা এই কাগজখানাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবে, অনেক দূরে, যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে আমার জন্য সব তর্কের অতীত এক নিশ্চিতি?

রাত ভারি হয়, বেজে যায় একটা, দেড়টা, ছুটো, চোখে ঘুমের নেশা ও মনের তলায় অশান্তি নিয়ে ঝাপসা হ'য়ে ব'সে থাকেন বিরূপাক্ষ, যেন এক মৃদু উত্তেজনা গায়ে জড়িয়ে, রাত্রির নীরবতায় আচ্ছন্ন। তন্দ্রার চাপে তাঁর ভাবনাগুলি এলোমেলো হ'য়ে ওঠে; যে-বিশ্বাস তাঁর মধ্যে বদ্ধমূল ব'লে তিনি এতকাল ধ'রে জেনেছেন, তাও যেন হারিয়ে যায় কোনো-কোনো মুহূর্তে, তাঁর মনে ভয়াবহভাবে প্রশ্ন হানা দেয়: এষা ব'লে সত্যি কি কেউ আছে? কখনো ছিলো? আমি কি তাকে দেখেছিলাম কখনো, ছুঁয়েছিলাম? যদি সে আমার কল্পনা না হয়, যদি সত্যি তার অস্তিত্ব থাকে কোথাও, তবে সে আসে না কেন? কোনো কথা কেন বলে না? তাকে আসতেই হবে, প্রমাণ করতে হবে নিজেকে, আমার উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিষ্ক্রিয় থাকার অধিকার তার নেই। কখনো-কখনো ঘুমের পর্দা ঠেলে তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে নারীমূর্তি—ব'সে আছে তাঁর টেবিলের পাশে ইজি-চেয়ারে, ঘরের সে-দিকটায় ছায়া ব'লে তার মুখ অস্পষ্ট, কিন্তু তার দেহের রেখাগুলি

যেন মূক নয়, যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে শব্দহীনভাবে কিছু বলছে সে, বলতে চাইছে। কিন্তু—কী? বিরূপাক্ষ কান পাতেন, মন দিয়ে শোনার জন্য এগিয়ে দেন মাথা, কেমন একটা ঝিমঝিম শব্দ, কোনো ছোট্ট পোকার একটানা গুঞ্জনের মতো, শুনতে-শুনতে ঝামরে নামে ঘুম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখতে পান আলোর তলায় সেই কাগজখানাকে। হিব্রু হরফ, গ্রীক হরফ, দেবনাগরি। তাঁর সন্ধান, তাঁর জীবনের কাজ, তাঁর পরীক্ষা। এর পরে আরো যদি প্রমাণ চাই তবে কি আমি নিজেরই দৈন্য প্রমাণ করবো না? বিরূপাক্ষ খাতাপত্র সরিয়ে উঠে দাঁড়ান, মনে হয় তাঁর কেন্দ্রে তিনি ফিরে এলেন এবার, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েন—কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসে না।

এমনি দোলা—তাঁর দিনে, তাঁর রাত্রে; অন্য যা-কিছু তাঁকে করতে হয়, তার সঙ্গে-সঙ্গে, অন্তরালে।

আরো দশ বছর কাটলো। ইতিমধ্যে আরো একটি পুঁথি প্রকাশ করলেন বিরূপাক্ষ: শো-দেড়েক পৃষ্ঠা মূল লিখন, সাতাশি পৃষ্ঠা টীকা—হরেক রকম চিহ্নে ও লিপিতে সমাকীর্ণ—তার শিরোনামা: 'চৈনিক, রাশিয়ান ও প্রাচীন ইরানির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রস্তাব'—যাতে ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহের উৎপত্তি বিষয়ে নতুন একটি ধারণা উপস্থিত করা হয়েছে। বিদেশী পণ্ডিতমহলে এটি আরো বেশি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো, অনেক বাদানুবাদ হ'লো তাঁর প্রতিপাদ্য নিয়ে, অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করলেন, কেউ নিবন্ধটিকে চিহ্নিত করলেন 'বৈপ্লবিক' ব'লে, আবার কেউ বা আক্ষেপ করলেন এই ব'লে যে অন্য অনেক হিন্দুর মতোই, শ্রীযুক্ত রে খেদজনকভাবে বিজ্ঞান ছেড়ে মিস্টিসিজ্‌ম-এর দিকে ঝুঁকেছেন। ছ-মাসের মধ্যে বইটির জর্মান ও ফরাশি অনুবাদ বেরিয়ে গেলো, কিন্তু যেহেতু ভারতে তখন রাজনৈতিক বিপর্যয় চলছে, তাই পূর্বোল্লিখিত দুর্ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হ'লো না এবার; তাঁর পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ও উপাদেয়ভাবে তাঁর

এই নতুন প্রয়াসটি স্বদেশে সম্পূর্ণ অলক্ষিত র'য়ে গেলো। কাঁটায়-কাঁটায় বাষট্টি বছর বয়সে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলেন তিনি—যদিও চাইলেই আরো বছর তিনেক ঝুলে থাকার কোনো বাধা ছিলো না, আর সুহাসিনী সেজন্যে অনেক পিড়াপিড়িও করেছিলেন। একই সময়ে 'বাক্' পত্রিকার সম্পাদনাভার অর্পণ করলেন এক তরুণতর সহকর্মীকে, অনেক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে ভাষাবিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতির পদও ত্যাগ করলেন। এখন তাঁর সমস্ত সময় গবেষণার জন্য তাঁর নিজের দখলে। কিন্তু—তাঁর আত্মীয়রা সবিস্ময়ে লক্ষ করলো—তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আশাতীতভাবে বদলে গেলো সময়ে। এই এখন আর তিনি পুঁথিপত্রে নাক গুঁজে সারাদিন কাটান না, তেতলায় লাইব্রেরি-ঘরে তাঁর চেয়ারটি প্রায়ই খালি প'ড়ে থাকে, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ শিথিল। বিদেশ থেকে স্থূলকায় যে-সব জর্নাল আসে—এতদিন যা পাওয়ামাত্র ব্যগ্র হাতে পাতা ওল্টাতেন—সেগুলো অনেক সময় মোড়ক না-খুলে তুলে রাখেন। আরো আশ্চর্য: পারিবারিক সম্মেলনে যোগ দেন মাঝে-মাঝে, পুত্র কন্যা জামাতা পুত্রবধূর সঙ্গে হাল্কা হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠেন—পপ্-আর্ট বা বীট্‌লসংগীত বিষয়েও তাঁকে কৌতূহলী ব'লে মনে হয়। লক্ষ করা গেলো, বাড়িতে যখন কন্যা বা পুত্রবধূর সমবয়সী মেয়ে-বন্ধুরা আসে, তখন্ তিনি, অন্যদের অগুপ্ত অস্বস্তি ঘটিয়ে, অনাহূতভাবে সেই তরুণীমণ্ডলে কিছুক্ষণ সময় কাটান, কিছুটা বিস্ময়ের চোখে তাকান তাদের দিকে, অনাবশ্যক আলাপ করেন, আর মাঝে-মাঝে এমন চটুল কথাও ব'লে ফ্যালেন, যা তাঁর বয়স ও মর্যাদার পক্ষে বেমানান। ছেলে কিছুদিন হ'লো আরো বড়ো পদ নিয়ে কলকাতায় বদলি হ'য়ে এসেছে; এতদিন যাকে বিশেষ লক্ষ করেননি, সেই পৌত্রী এগারোতে পড়ার পর থেকে হঠাৎ তার সঙ্গে ভাব জ'মে উঠছে বিরূপাক্ষর, তাকে নিয়ে বেড়াতে যান রবীন্দ্র-সরোবরে বা গঙ্গার

ধারে, তার ছেলেমানুষি বকুনি শুনতে-শুনতে তাঁর মুখে মুগ্ধতা ফুটে ওঠে। একদিন সকালে তাঁকে উত্তেজিত দেখা গেলো দৈনিকপত্রে সত্যমৃতা মধুবালার ছবি দেখে ও জীবনবৃত্তান্ত প'ড়ে; অমন একজন অসামান্যা রূপসী—যার সচল ও সবাক ছায়ামূর্তি সারা দেশের হৃদয় জয় ক'রেছিলো, তার অভিনয় একবারও না-দেখে তাঁকে ম'রে যেতে হবে, এ-কথা ব'লে এমনভাবে আক্ষেপ করতে লাগলেন যাতে ছেলের-বৌ উদ্গত হাসি চাপতে পারলো না। 'আচ্ছা দেখি,' সান্ত্বনার্থে সে শ্বশুরকে বললো, 'যদি কোথাও "মুঘল-ই-আজ়ম" আসে, আপনাকে নিয়ে যাবো। বিরূপাক্ষ সাগ্রহে জিগেস করলেন, 'এখনকার সুন্দরী কারা?' 'এখন?' পুত্রবধূ গড়গড় ক'রে কয়েকটা নাম আউড়ে গেলো, কার অভিনয়ের কী বৈশিষ্ট্য, তার বর্ণনা দিলো, বিরূপাক্ষ মন দিয়ে শুনলেন। 'এখন সায়রা বানুর একটা বই হচ্ছে। যাবেন?' ' "বই"? "বই" মানে? ছেলে উত্তর দিলো, 'ফিল্মকেই "বই" বলে আজকাল।' 'আজকাল কেন—অনেকদিন ধ'রেই,' মন্তব্য করলো ছেলের-বৌ। 'আমি তো বাচ্চা বয়স থেকে এ-ই শুনে আসছি।' 'সত্যি বলছো? অনেকদিন ধ'রেই চ'লে আসছে? "বই" মানে ফিল্ম! আশ্চর্য! আর আমি জানতাম না! তবেই বোঝো—' অনেকদিন আগে শোনা একটা কথার অচেতন প্রতিধ্বনি ক'রে বিরূপাক্ষ অবান্তরভাবে বললেন, 'তবেই বোঝো, একটা ভাষা পুরোপুরি শিখে ওঠাও কত শক্ত—তায় আবার অনেকগুলো!' ছেলের-বৌ ততক্ষণে খবর-কাগজে আমোদপ্রমোদের বিজ্ঞাপনগুলো দেখছিলো, মুখ তুলে বললো, 'এই তো "বিজলী"তে হচ্ছে, বলেন তো টিকিট আনতে পাঠাই!' 'পাগল নাকি?' ছেলে কড়া গলায় প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'বাবার ওপর এই অত্যাচার ক'রে লাভ আছে কিছু!'—কিন্তু সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বিরূপাক্ষ এক সপ্তাহের মধ্যে পরিবারের মহিলা ক-টিকে সঙ্গে নিয়ে দু-দুটো হিন্দি ফিল্ম দেখে এলেন—যাতে সায়রা বানু আর তনুজা রূপায়িত। মেয়ে

বলেছিলো, 'আমি লিখে দিতে পারি, বাবা দশ মিনিটের মধ্যে পাগল হ'য়ে বেরিয়ে আসবেন হল থেকে—' কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটলো না, বরং বাড়ি ফিরে এসে বিরূপাক্ষ দুই নায়িকার রূপ ও অভিনয়নৈপুণ্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলেন অনেকক্ষণ ধ'রে।

তাঁর এই অদ্ভুত পরিবর্তন—যাতে পরিবারবর্গের খুশি হবার কথা ছিলো—তা কিন্তু কারো মনেই আশানুরূপ প্রীতি উৎপাদন করলো না। বহুদিনের অভ্যাসবশত (আর সত্যি বলতে তাঁর অনুপস্থিতি কারো কোনো অসুবিধে ঘটায়নি ব'লেও) সকলেরই মনে হ'লো যে অন্য সব বিষয়ে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থেকে, তেতলার লাইব্রেরি-ঘরে দিন কাটালেই তাঁকে মানায়; যেন তাঁর পাণ্ডিত্যের তুঙ্গ শিখর থেকে বড়ো সাধারণ স্তরে নেমে আসছেন তিনি; তাঁর কাছে অনেক সময় অনেক আঘাত পেয়েও তিনি একজন 'অসাধারণ মানুষ' ব'লে তাদের মনে যে-গর্বটুকু ছিলো তা যেন তিনি অন্যায়ভাবে ভেঙে দিচ্ছেন। কন্যার মনে নতুন ক'রে অভিমান হ'লো এ-কথা ভেবে যে বাবা অসিতের ছবি নিয়ে কখনো কিছু বলেননি আর আজ শস্তা হিন্দি ফিল্ম নিয়ে ছেলে-মানুষের মতো মাতামাতি করছেন, তাই সে প্রতিবাদ করতে পারলো না যখন অসিত একদিন মুচকি হেসে বললো, 'তোমার বাবার ঘিলু গ'লে যাচ্ছে,' এদিকে সুহাসিনীও একদিন কথায়-কথায় ছেলের-বৌকে বললেন, 'তোমার শ্বশুরকে আর সিনেমা দেখার জন্য খেপিয়ো না তো, শেষটায় না ভীমরতিতে ধরে।'

৬

অবশ্য বিরূপাক্ষ তখনও তাঁর গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, শুধু তাঁর রণকৌশল বদলে গিয়েছিলো। পুরো সমস্যাটিকে এখন এক ভিন্ন দিক

থেকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি ; কোনো-কোনো তন্দ্রাচ্ছন্ন গভীর রাত্রে তিনি ইতিপূর্বে যা অনুভব করেছিলেন, এখন তা-ই বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে ; অর্থাৎ তিনি মেনে নিয়েছেন যে তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি', যার অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করেছেন এতদিন — এই বিশেষ ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য নয়। এতদিন ধ'রে এত দিক থেকে আক্রমণ ক'রে আসছি লিপিটিকে ; বাঁয়ে থেকে ডাইনে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, উপর থেকে নিচে, কোনাকুনি ; অনেক রকম সাংকেতিক বর্ণমালা উদ্ভাবন ক'রে, অনেক রকম মিশ্রভাষার কাঠামো গ'ড়ে তুলে, কিন্তু যা ফলাফল পেয়েছি তা সবই অগ্রাহ্য, সবই আরো ভুল পথে আমাকে নিয়ে গিয়েছে। ক্রমশ তাঁর মনে হ'তে লাগলো তাঁব ভাষাজ্ঞানও আসলে অজ্ঞানতারই একটি প্রচ্ছদমাত্র ; এত ছোটো এই জীবন (আবার অচেতনভাবে অন্য একজনের প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি ভাবলেন) — এর মধ্যে ক-টাই বা ভাষা আমরা শিখতে পারি ! অসংখ্য ভাষা আছে, যাদের বিষয়ে অণুমাত্র ধারণা আমার নেই, যাদের অস্তিত্ব আছে ব'লেও আমি জানি না, আর আমি যাঁদের তুলনায় নগণ্য এক শ্রমিকমাত্র, তেমন সব প্রতিভাবানেরাও সেই বিশাল বাবেল-স্তম্ভের কাছে আমারই মতো শিশু ছাড়া আর কী ? বাণ্টু, স্বাহিলি, এস্কিমো — সকলেই সবাক ও সুব্যক্ত, মার্কিনী আদিবাসীরা সংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্ত ও অন্য এক বলীয়ান ভাষার দ্বারা পরিবৃত হ'য়েও, এখনো নাকি শো-প্যাঁচেক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। তাহ'লে কী নিষ্ফল, কী অর্থহীন এই আমরা, যারা নিজেদের ভাষাবিদ ব'লে ভেবে থাকি — মাত্র দশ, বারো, বা বড়োজোর কুড়িটি ভাষার মূলধন নিয়ে ! তাছাড়া, ভাষা তো শুধু মানুষেরই সম্পত্তি নয় ; বেড়ালের আছে প্রেমসংগীত, শিম্পাঞ্জিরা তর্কপরায়ণ, গৃহপালিত কুকুর শুধু কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচ ছন্দের দ্বারা জানাতে পারে ক্ষুধা, ভয়, আদর ও চোরের আগমন। কিন্তু বুনো কুকুরের গলায় স্বরগ্রামের এই ব্যাপ্তি নেই — বলা হ'য়ে থাকে, মানুষের সহবাসী হ'য়ে, মানুষের অনুকরণ ক'রে, গৃহপালিত

কুকুর তার 'ভাষা' শিখেছে। কিন্তু—এই অনুমান কি সব ক্ষেত্রে গ্রাহ্য? ধরা যাক বাদুড়—মানুষের সংসর্গ থেকে সুদূর সেই দিবান্ধ জীব, যাদের কণ্ঠনিঃসৃত কোনো ধ্বনি আমরা সাধারণ জীবনে কালে-ভদ্রে শুনতে পাই, পঞ্চাশ বছর আগে এক জর্মান পণ্ডিত তাদেরও ভাষার শব্দলিপি প্রকাশ করেছিলেন। আর সম্প্রতি ক্যালিফর্নিয়ায় একদল বিজ্ঞানী জলহস্তীর ভাষা রেকর্ড ক'রে নিয়েছেন, তার স্বরগ্রামের ব্যাপ্তি নাকি মানুষেতর জীবের পক্ষে অসাধারণ। এখন পর্যন্ত মানবসমাজে এই ধারণা চলছে যে মানুষই শুধু সত্যিকার অর্থে 'কথা বলতে' পারে—যেহেতু সে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, যেহেতু তার জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর ক্ষমতা অসামান্য, যেহেতু তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন অতি জটিল··· এই ধরনের নানা যুক্তি সাজিয়ে মানুষই মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু কে জানে হয়তো মাছেরাও বোবা নয়—আমাদেরই কর্ণপটাহের শক্তি অতি সীমিত, আর এমন কোনো যন্ত্রও এখনো বেরোয়নি, যাতে মাছেদের অতি মৃদু বা অতি প্রচণ্ড আওয়াজ ধরা পড়তে পারে। আমরা নিজেরা মানুষ ব'লে মানুষের চোখেই জগতের দিকে তাকাই, মানুষের মন আর বুদ্ধি নিয়ে অন্য প্রাণীদের আচার-ব্যবহার লক্ষ করি (তা ছাড়া উপায় নেই আমাদের)—এ-অবস্থায় কী ক'রে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অন্য প্রাণীদের ভাষা বিষয়ে, বা মানুষের ভাষার উৎস বিষয়ে যা-কিছু এতদিন ধ'রে অনুমিত হয়েছে, সেগুলি সবই নয় বাতাসে-ভেসে-বেড়ানো লূতাতন্তুর মতো অস্পষ্ট ও অস্থায়ী?

ভঙ্গি থেকে, নৃত্য থেকে, যুদ্ধ থেকে, চীৎকার বা শীৎকার থেকে—ভাষার জন্ম বিষয়ে যত তত্ত্ব তিনি এককালে পড়েছিলেন, তার কোনোটাকেই বিরূপাক্ষ এখন আর মানতে পারেন না—তাঁর কল্পনায় ভাষাগুলির পরিবারগত বিভাগও লুপ্ত হ'য়ে গেছে, চৈনিকের সঙ্গে ইংরেজির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, এই সর্বস্বীকৃত প্রস্তাবেও তিনি সন্দিহান হ'য়ে উঠেছেন। তাঁর মনে হয় এ-বিষয়ে পুরাণ-কথাই সত্যবাদী। কোনো-

এক উচ্চারণ, জড় বিশ্বে প্রথম প্রাণের শিহরন যেন—তারই প্রতিধ্বনি যুগে-যুগান্তরে গড়িয়ে-গড়িয়ে রচনা করেছে সেই সব শব্দসমষ্টি, স্বর ও ব্যঞ্জন, প্রস্বর ও অনুস্বর, যার বহুবিচিত্র সামঞ্জস্যকে আমরা ভাষা ব'লে অভিহিত করি। যেমন জলে ঢিল পড়লে অনেকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত গ'ড়ে ওঠে, এও তেমনি, শুধু তার বিস্তার অনিঃশেষ, ঢেউ কখনো থামে না। প্রতিধ্বনির ঢেউ, অনুরণনের অনুকম্পন—আসল নয়, বিভিন্ন ধরনে ভেজাল, অর্থাৎ, সব ভাষাই আদিভাষার অপভ্রংশমাত্র—বাণ্টু বা মুণ্ডাদের তথাকথিত অপরিণত ভাষা যতটা, সংস্কৃত বা গ্রীক, ইংরেজি বা ফরাশির মতো তথাকথিত দক্ষ ভাষাও ততটাই। আর তাই আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারি না, একই ভাষায় বা উপভাষায় কথা ব'লেও অনেক সময় পরস্পরকে বুঝতে পারি না; বানর, বাদুড়, জলহস্তীর মন আমাদের কাছে অনাবৃত থেকে যায়, এই জগৎ ও জীবনের যত না আমরা ব্যাখ্যা করি সবই হয় শোচনীয়রূপে আংশিক ও সংশোধনসাপেক্ষ। কিন্তু আসিসির সন্ত ফ্রান্সিস পাখিদের সঙ্গে সংলাপ চালাতেন, গুণাঢ্য 'পৈশাচিক' প্রাকৃতে 'বৃহৎ কথা' লিখে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন বনের পশুদের, অর্ফিয়ুসের গান মুগ্ধ করেছিলো বৃক্ষ, শিলা, শ্বাপদবংশকে। এই কাহিনীগুলো এক বিশ্ব-ভাষার দিকেই ইঙ্গিত করছে না কি—কোনো কৃত্রিম এস্পেরান্তো বা সওদাগরি বেজ়িক-ইংলিশ নয়, নয় কোনো বিশেষ ভূখণ্ডে আবদ্ধ বা কোনো ক্ষুদ্র কার্যসিদ্ধির উপায় শুধু—কিন্তু ব্যাপকতম অর্থে সর্বজনীন, নিখিলপ্রকৃতির স্বাভাবিক মাতৃভাষা, পৃথিবীর অসংখ্য, বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মধ্যে যোগসূত্র? যেমন ভগ্নাংশ অন্তহীন হ'লেও পূর্ণসংখ্যার মধ্যে সবই সমাহৃত থাকে, তেমনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সমস্ত খণ্ড ভাষাকে ধারণ ক'রে আছে সেই আদি বাক্, যা তার নিজের মধ্যে অনন্য ও অমোঘ, কিন্তু বহুর মধ্যে বিকীর্ণ হ'য়ে আছে ব'লে আমাদের বিশেষীকৃত বিজ্ঞান যার নাগাল পায় না। তারই কোনো একটি রশ্মি যদি আমাকে ধরা দেয় কখনো,

তাহ'লে পৃথিবীর কোনো ভাষাই আমার অজানা থাকবে না, আর মুহূর্তে প্রাঞ্জল হ'য়ে যাবে সেই বার্তা, যাকে আক্ষরিক উপায়ে এতদিন ধ'রে খুঁজে-খুঁজে আমি শুধু শ্রান্ত করেছি নিজেকে।

বিরূপাক্ষ তাঁর কল্পনার সাহসে চমকে উঠলেন, প্রথমে প্রায় ভয় পেলেন। আমার পক্ষে উচিত হবে কি সেই পথ থেকে স'রে দাঁড়ানো, যা আমার বহুকালের অভ্যস্ত, আর যাতে বহু জ্ঞানীজন তাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখে গেছেন? আমি যা ভাবছি তাতে কোনো বিচারবুদ্ধির সমর্থন তো নেই। কিন্তু কোনো বিচারবুদ্ধি কি রঞ্জন-রশ্মি ধারণা করতে পেরেছিলো? ত্বক মাংস ভেদ ক'রে দেহের আভ্যন্তরীণ রহস্য ফুটিয়ে তুলবে, এমন কোনো রশ্মি যদি আবিষ্কৃত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে কেন, কোনো-একদিন, আমরা খুঁজে পাবো না অন্য এক অদৃশ্য কিরণ, যা লিপি ও অর্থবোধের আচ্ছাদন পেরিয়ে যে-কোনো ভাষার মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করবে? এই ঘনত্বভেদক রশ্মি, যা কিছুদিন আগেও ছিলো কল্পনাতীত—তা তো সৃষ্টির আরম্ভ থেকে প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো, আর এখন তা নিতান্ত এক প্রাকৃত বস্তু বলেই গণ্য। তেমনি, সেই আদিভাষাও অপেক্ষা ক'রে আছে—কবে হঠাৎ আমাদেরই কারো হাতে তার আবরণ উন্মোচিত হবে। সহজ—খুব সহজ—মাঝখানে একটি পাৎলা পর্দা শুধু, যেন প্রায় ন'ড়ে ওঠে এক-এক সময়, প্রায় এগিয়ে এসে ধরা দিতে চায়।

ভাবতে-ভাবতে বিরূপাক্ষর মনে হ'লো অলৌকিকে ও প্রাকৃতে সাধারণত যে-পার্থক্য করা হয়, সেটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো কুসংস্কার। আমরা কিছুই উদ্ভাবন করতে পারি না, মাঝে-মাঝে শুধু আবিষ্কার ক'রে থাকি। আছে—সবই আছে একই সঙ্গে এই বিশ্বে—যা-কিছু আমাদের ঈপ্সিত, আমাদের দুরাশার সন্ধান—যা-কিছু এ-মুহূর্তে আমাদের ধারণার অগম্য তাও আছে: শুধু খুঁজে পাওয়া দিয়ে কথা। আমি কি তবে তেমনি কোনো আবিষ্কারের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, যাকে

লোকেরা পরে বলবে আশ্চর্য, যুগান্তরকারী? বিরূপাক্ষর বুকের মধ্যে দুরদুর ক'রে উঠলো, বিস্ময়ে ও বিনয়ে অভিভূত হ'য়ে তিনি বুকে হাত চেপে মাথা নিচু করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অন্য একটি কথা তার মনের তলা থেকে লাফিয়ে উঠলো, যেন স্পষ্ট পথরেখা দেখতে পেলেন চোখের সামনে। আক্রমণ অনেক হ'লো—এবার আত্মসমর্পণ। আমি যা খুঁজছি তা তো স্বয়ংপ্রভ (কেননা জগতের ভাষাগুলি তারই দুর্বল প্রতিফলন মাত্র)—তা পাবার জন্য কেন প্রয়োজন হবে বুদ্ধি, বিদ্যা, বিশ্লেষণ, পরিশ্রম? সূর্য ওঠামাত্র আলোকিত হয় জগৎ—তা কি চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয় আমাদের? যে-পরিত্যক্ত বন্ধ ঘরে বহুকাল ধ'রে অন্ধকার জ'মে আছে, আর বৈদ্যুতিক বৈকল্যের ফলে যে ঘর পাঁচ মিনিট আগে অন্ধকার হ'লো—একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালামাত্র দুটোতেই তো একই সময়ে আলো ফুটবে। বহুকালের পুঞ্জিত তিমির কাটাবার জন্যও এক লহমাই যথেষ্ট। তাহ'লে—জ্ঞানে কী-লাভ? এক মূর্খ বনচর দস্যু অকস্মাৎ ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করেছিলো। এক চতুর তস্কর নিহত জন্তুর অন্ত্রতন্ত্র দিয়ে প্রথম বীণায় তার বেঁধেছিলো। আমাকে এবার সব শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। ভান করতে হবে যেন আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলে গিয়েছি। একেবারে নতুন ক'রে আরম্ভ করতে হবে আমাকে।

এটাই কারণ, যেজন্যে বিরূপাক্ষর দৈনিক রুটিন অমন চমকপ্রদভাবে বদলে গিয়েছিলো, অথবা তিনি রুটিন ব্যাপারটাকেই ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি অপেক্ষা করছেন—এই অপেক্ষার সময়টুকু খুব সহজভাবে তাঁকে কাটাতে হবে, নিজের উপর কোনোরকম জবরদস্তি না-ক'রে, চিন্তাহীন, নিরভিমান। তাঁর দিনগুলিকে ভরাতে হবে হাতের কাছে যখন যা পাওয়া যায় তা-ই দিয়ে—আর এ-কথা ভাবা প্রকাণ্ড ভুল যে হাতের কাছে সহজে যা পাওয়া যায় তা-ই তুচ্ছ, বা তাঁর পক্ষে অবান্তর। না—সবই সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে পরস্পরে, সবই সেই পূর্ণসংখ্যার

বহুবিচিত্র ভগ্নাংশ। সব-কিছুই তাঁর পক্ষে এখন প্রয়োজনীয়। তাঁকে লক্ষ ক'রে দেখতে হবে যুবতী মেয়েদের অঙ্গভঙ্গি, সিনেমার পর্দায় রূপসীদের সচেতন লাস্য, কেমন ক'রে বালিকার লাজুক ঠোঁট থেকে সারা মুখটিতে হাসি ছড়িয়ে পড়ে, পুত্রবধূর পোষা কুকুরটি কেমন করুণভাবে মুখ তুলে তাকায়, সন্ধেবেলা তাঁর বাথরুমের আয়নায় সূর্যাস্তের যে-রেখাটুকু ঠিকরে পড়ে সেটি কেমন উদ্ভাসিত ক'রে তোলে দেয়াল-গুলোকে ··· শুনতে হবে মন দিয়ে বৃষ্টির শব্দ, রাস্তায় জল দেবার শব্দ, ভোরবেলা প্রথম ট্রামের শব্দ—এই সব উপাদানের অন্তঃসারকে জমিয়ে রাখতে হবে গোপন কোনো খাদ্যের মতো তাঁর নিজের মধ্যে, যেখানে তাঁর অজ্ঞাতসারে তিলে-তিলে বেড়ে উঠছে, কোনো বিশাল মাতার গর্ভে বহুকাল ধ'রে জায়মান কোনো ভ্রূণের মতো—সেই বার্তা, যা তিনি এতকাল ধ'রে ব্যর্থভাবে বাইরে খুঁজেছেন। যেন এক দূর নক্ষত্রের বিভা অনেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ··· তাঁর দিকে। আমার কিছু করার নেই—যা আসন্ন তাকে আসতে দেয়া ছাড়া। আমার কিছু ভাবার নেই, আমি শুধু প্রস্তুত।

৭

বিরূপাক্ষর এই নতুন উপলব্ধির অন্যদিকেও কিছু ফলাফল হ'লো। সেই চিহ্নাঙ্কিত কাগজখানা—এতদিন ধ'রে যার বহু পরিচর্যা তিনি করেছিলেন, রেখেছিলেন স্বচ্ছ প্লাস্টিকের খামের মধ্যে টান ক'রে ঢুকিয়ে (পাছে ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়ে যায়), যাতে মাসে একবার ক'রে কীটনাশক ওষুধ ছিটোতে কখনো ভোলেননি—সেটিকে তাঁর শোবার ঘরের লোহার সিন্দুকে তুলে রাখলেন এবার, তাঁর বহু বছরের শ্রমপ্রসূত টীকা-

টিপ্পনিভরা খাতাগুলো সুদ্ধ। এখন আর তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে ওগুলো তাঁর কোনো কাজে লাগবে; তাঁর ঈষৎ হাসি পায় সেই সব দিনের কথা ভেবে, যখন তিনি শুতে যেতেন বালিশের তলায় প্লাস্টিকের খামটিকে নিয়ে, হাতের কাছে রাখতেন খাতা, পেন্সিল, বেড-সুইচ; অতীতের সেই মুহূর্তগুলিকে তাঁর করুণ ব'লে মনে হয়, যখন তিনি গভীর রাতে আলো জ্বেলে উঠে বসেছেন বিছানায়, জ্বোরো হাতে লিখে গিয়েছেন পঙক্তির পর পঙক্তি, নানা রকম নকশা এঁকেছেন, অনুমিত বাক্যগুলিকে নিঃশব্দে উচ্চারণ করেছেন ঠোঁট নেড়ে-নেড়ে, তারপর হঠাৎ সংশয়ের ছোরায় বিদ্ধ হ'য়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছেন। অসংখ্য-বার পর্যবেক্ষণের ফলে সেই চিঠির একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত প্রতিলিপি সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে গেছে তাঁর মগজে; অন্ধকারে চোখ বুজলেই প্রতিটি রেখা ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে; তিনি ইচ্ছে করলে অনেকক্ষণ ধ'রে রাখতে পারেন সেটাকে, আর যদি কখনো মনে-মনে বলেন, 'আমার ঘুম পেয়েছে—এখন থাক,' তাহ'লেই তা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যায়। ঘুমের আগে, বা সকালে জেগে ওঠার মুহূর্তে, এমনি এক খেলা চলে তাঁর সঙ্গে ঐ রহস্যলিপির।

উপবিষ্ট কাজে দিন কাটাবার ফলে বিরূপাক্ষ বরাবরই কোষ্ঠ-কাঠিন্যে ভুগেছেন, ইদানীং তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাথমিক প্রাতঃকৃত্যের জন্য মিনিট পনেরো সময় ধ'রে রাখতে হয়। বিরক্তি ভুলে থাকার জন্য তিনি কোনো হালকা মেজাজের বই বা পত্রিকা হাতে নিয়ে বসেন, কিন্তু একদিন মনে প'ড়ে গেলো যে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে যেটুকু তাঁর স্বকীয় চিন্তা, তার প্রথম উন্মেষ হয়েছিলো, বহুকাল আগে—তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে নয়, ছাত্রদের পড়াতে-পড়াতে নয়—এই শৌচাগারের স্নিগ্ধ নির্জনতায়। সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকদিন পরে, মূল পাণ্ডুলিপিটি একবার চোখে দেখার ইচ্ছে হ'লো তাঁর; সেটি সিন্দুক থেকে বের ক'রে নিয়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন। তেমনি আছে—অর্থাৎ, মাস ছয়েক আগে যেমন

দেখেছিলেন, তেমনি। কিছুদিন ধ'রেই বোঝা যাচ্ছিলো যে লিপিখানার কায়িক অস্তিত্ব নির্ভরযোগ্য নয়: যে-অক্ষরগুলি প্রথমে ছিলো নিকষ-কালো, তা অনেক আগেই ধারণ করেছিলো খয়েরি বর্ণ, কিন্তু তাও এতদিনে হলদে ও ফ্যাকাশে হ'য়ে এসেছে, এত যত্ন সত্ত্বেও কয়েকটি কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে কাগজখানাতে, তার শুভ্রতাও এখন ধূসর ব'লে মনে হয়। বিরূপাক্ষ চেষ্টা করলেন একেবারে নতুন চোখে তাকিয়ে দেখতে, যেন এই প্রথম দেখছেন, কিন্তু ভান টিকলো না, দৃষ্টিপাত করামাত্র সমস্ত পূর্ব-ইতিহাসের চাপে কাগজখানা তাঁর হাতে যেন ভারি হ'য়ে উঠলো। না—নতুন ক'রে দেখার কিছু নেই, সব জানেন তিনি, সব যুদ্ধ পেরিয়ে এসেছেন, অনেক ধূপ দগ্ধ করেছেন, কিন্তু এই অক্ষরময়ী দেবীমূর্তির চোখের পলক পড়েনি। দীর্ঘশ্বাস পড়লো বিরূপাক্ষর, আসীন অবস্থায় অন্যদিনের চেয়ে কিছুটা বেশি সময় কাটালেন তিনি—অন্যমনস্কতার ফলে এতটাই বেশি যে দরজায় টোকা পড়লো, বাইরে থেকে তাঁকে জানানো হ'লো যে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে ('আসলে হয়তো ওরা ভয় পেয়েছে আমি অজ্ঞান-টজ্ঞান হ'য়ে যাইনি তো—এ-রকম তো প্রায়ই হচ্ছে আজকাল।')—বিরূপাক্ষ ওদের আশ্বস্ত করার জন্য 'আসছি' ব'লে উঠে দাঁড়ালেন, আর হঠাৎ, তাঁর কোনো দ্রুত বা অসতর্ক ভঙ্গির ফলে, পাণ্ডুলিপিটি প্লাস্টিকের খাম থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো। পড়লো একেবারে সেখানে, যেখানে তিনি সদ্য মলত্যাগ করেছেন। মুহূর্তকাল চিন্তা না-ক'রে তিনি নোংরা জলে হাত ডুবিয়ে সেটি তুলে নিলেন, অন্ধভাবে বেসিনের কল খুলে তার তলায় পেতে দিলেন কাগজখানাকে। পরিষ্কৃত—বড়ো বেশি পরিষ্কৃত—পীতবর্ণ অক্ষরগুলি জলের মধ্যে গ'লে যেতে লাগলো, নিশ্চিহ্ন হ'লো সব লিখন, আর কাগজখানা গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়লো বেসিনের উপর, গর্ত দিয়ে স্বচ্ছন্দে চ'লে গেলো সেই নাগরিক পাতালে, যেখানে অসংখ্য মানুষের ক্লেদের স্রোত প্রবহমান। আর এই সবই ঘটলো মাত্র

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, তাঁর চোখের সামনে—বিরূপাক্ষ দ্বিতীয়বার চিন্তা করার সময় পেলেন না, স্মৃতিচিহ্নরূপেও একটি টুকরো বাঁচাতে পারলেন না। যতক্ষণে তিনি কল বন্ধ করেছেন, ততক্ষণে কোনো চিহ্ন নেই।

এই দুর্ঘটনার প্রথম আঘাতে বিরূপাক্ষর মনে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন ভাব জেগে উঠলো। নিজেকে তাঁর মনে হ'লো অপরাধী—তাঁরই অমনোযোগের ফলে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হ'লো যেন, এমন কেউ, যে জীবনব্যাপী সঙ্গী ছিলো তাঁর। কিন্তু কারো মৃত্যু হ'লে আমরা যেমন তখনকার মতো মৃতের কথা বেশি ক'রে ভাবি, মৃত ব্যক্তি নতুন ক'রে বেঁচে ওঠে আমাদের মনে, তেমনি প্রবলভাবে বিরূপাক্ষর মনে পড়লো—সেই বাস্তব মানুষটিকে, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন এষা, যেমন তাকে দেখেছিলেন, কুড়ি বা পঁচিশ বছর আগে, মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরে। তাঁকে বিস্মিত ক'রে, প্রায় অভিভূত ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে ফিরে এলো এষার মুখশ্রী, দেহকান্তি, কণ্ঠস্বর। হঠাৎ যেন ঝাপট দিলো বাসনা, তাকে আবার দেখার জন্য, স্পর্শ করার জন্য। মনে পড়লো রোদ, ঝিরঝির বৃষ্টি, হালকা হাওয়া, পাথরে-বাঁধানো গলি আর উদার পিয়াৎসা—নিজেকে দেখতে পেলেন আমেরিকান এক্সপ্রেসে, দশ-বারোজনের পিছনে চিঠির জন্য দাঁড়িয়ে; সেই মুহূর্তের আশা, উৎকণ্ঠা, ব্যর্থতায় তাঁর বুকের মধ্যে আবার মুচড়ে উঠলো। আর তারপর, এমনি অস্থিরতায় কেঁপে-কেঁপে, ধীরে-ধীরে তিনি খুঁজে পেলেন সমাধান, এগিয়ে গেলেন সেই শান্ত অবসানের দিকে, যা সময় আমাদের অজান্তে তৈরি ক'রে রাখে আমাদের জন্য, যাতে মানুষ অত্যন্ত বেশি কষ্ট না পায়।

কবে থেমে গেলো সেই স্মৃতি ও বাসনার ঢেউ, যা চিঠিখানা লুপ্ত হবার ফলে পুনর্জীবিত হয়েছিলো, বিরূপাক্ষ তা টেরও পেলেন না। যা কোনো দূর কালে বাস্তব ছিলো, তা বিশুদ্ধ একটি ধারণায় রূপান্তরিত হ'লো তাঁর মনে, তাঁর চিন্তা এক নতুন ভারসাম্য খুঁজে পেলো। মূল

চিঠিখানা আর নেই ব'লে এখন আর তিনি পরিতপ্ত নন, বরং তার আকস্মিক অবলোপে একটি ঔচিত্য দেখতে পান। জড়বস্তু পঞ্চভুতে বিলীন হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক—বাঞ্ছনীয় বললেও ভুল হয় না,—কেননা তার পরেও কিছু থেকে যায়, আর সেই উদ্বৃত্ত তখনই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে, যখন বস্তুর আড়াল স'রে যায়। কে না বোঝে, দেবীকে আমাদের সারা জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যই প্রতিমার বিসর্জন দরকার। কিংবা হয়তো চেষ্টা ক'রে ছড়িয়ে দিতেও হয় না, যে-বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, এও তারই মতো স্বতস্ক্রিয়। যখন গুমোট, যখন গাছের পাতাটি নড়ে না, তখনও তো বাতাস আছে—সব সময়, সকলের জন্য। এটা কী—আমি যাকে এতকাল ধ'রে ভেবেছি 'চিঠি', 'আমার চিঠি'? ঐ 'আমার' কথাটা অহংকারী নয় কি, ভ্রান্ত নয় কি? ও-রকম কোনো কাজ, কোনো দায়িত্ব, কোনো সাবাক্ষণের সঙ্গী—তাছাড়া সত্যি কি বাঁচতে পারে কেউ? হেসে-খেলে বেঁচে থাকে লোকেরা, যে-কোনো একটা ছুতো ক'রে কাটিয়ে দেয় সময়—যতদিন-না আসল কাজে ডাক পড়ে। 'এই নাও চিঠি—তোমার চিঠি—কী লেখা আছে প'ড়ে দ্যাখো।' একই চিঠি জনে-জনে, অথচ প্রত্যেকে ভাবে তা শুধু তারই জন্য—আর তাই তো রহস্য এত গভীর। কোনো সভায়, কোনো পরিষদে, কোনো সম্মেলনে এর সমাধান হবে না, কোনো কাজে লাগবে না পাণ্ডিত্য বা বিচারবুদ্ধি, যে যার নিজের মনে উত্তর খুঁজবে—শুধু নিজেরই মধ্যে, বাইরে কোথাও নয়। বাড়ির লোকেদের মুখের দিকে মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকান বিরূপাক্ষ, কখনো রাস্তায় বেরোলে লোকেদের মুখের ভাব লক্ষ করেন—এদের মধ্যে কারো হাতে কি পৌঁছে গেছে চিঠি, বা পৌঁছবে শিগগির, কেউ কি জানে সে কোন আশায় অস্থির হ'য়ে ছুটোছুটি করছে? তাঁর মনে হয় এরই জন্য তাঁর নাৎনি কিশোরী হ'য়ে উঠছে, অত যত্ন নিয়ে সাজে তাঁর মেয়ে আর

ছেলের-বৌ, তাঁর ব্যস্ত চাকুরে-ছেলের দৃষ্টি মাঝে-মাঝে উদাস হ'য়ে যায়, তাঁর জামাই রং-তুলি নিয়ে খেলা করে। তারা চায়, তারাও তা-ই চায়, যা তাঁর মধ্যে বড়ো হ'য়ে উঠেছে এতদিন 'ধ'রে, তাঁকে ভ'রে রেখেছে কানায়-কানায়, বছরের পর বছর। তা-ই চায় তারা—কিন্তু এখনো তা টের পায়নি। এক-এক সময় কাউকে ডেকে প্রায় তাঁর গোপন কথাটি ব'লে দিতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে, 'পেয়েছো? চিঠি পেয়েছো?'—কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নেন নিজেকে, পাছে ওরা ভাবে তিনি পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন।

যেন জীবনে এই প্রথমবার বিরূপাক্ষর সুখী মনে হ'লো নিজেকে; তিনি বেঁচে আছেন এটুকুই যেন যথেষ্ট, আর-কিছু তাঁর করণীয় নেই, কাঙ্ক্ষণীয় নেই। আসলে সত্যি হয়তো তাঁর মাথার মধ্যে কোনো গোলযোগ ঘটছিলো এই সময়ে; কখনো কোনো পণ্ডিতি বইয়ের পাতা খুললে ভালোমতো অর্থ বুঝতে পারেন না, মনে-মনে ভাবেন, 'এ-সব লোকে লেখে কেন? এ-সব দিয়ে কী হয়?' একদিন তাঁর স্বরচিত একটি পুরোনো নিবন্ধ দৈবাৎ তাঁর হাতে পড়েছিলো, দু-পৃষ্ঠা প'ড়েই এত শ্রান্তিবোধ করলেন যে সোফায় এলিয়ে ব'সে চোখ বুজতে হ'লো। আর-একদিন তাঁর মেয়ে একটা ফরাশি পত্রিকার কাটিং নিয়ে এলো তাঁর কাছে—হুয়ান মিরো বিষয়ে একটা ছোট্ট আলোচনা—সেটা প'ড়ে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বেশ কয়েকবার থামতে হ'লো তাঁকে, অভিধান দেখতে হ'লো। এতে তিনি নিজেই অবাক হ'য়ে গেলেন, কিন্তু দুঃখিত হলেন না—বরং তাঁর ভালো লাগলো এ-কথা ভেবে যে তাঁর ভাষাজ্ঞানের শক্ত আঁটুনি থেকে এতদিনে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর হয়েছে, কিছু পড়তে হ'লে চোখের খুব কাছে ধরতে হয়, কিন্তু চশমা বদল করার জন্য তাঁর গরজ নেই, কেননা পুঁথিপত্র তাঁর জীবন থেকে দূরে স'রে গেছে। এবং আরো দূরে—এতদিনে খুব ঝাপসা—সেই ঘটনাটি, যা থেকে অন্য সব গজিয়ে উঠেছিলো বলা

যায়—এবং এককালে যা কতই না বৃহৎ ব'লে তাঁর মনে হয়েছিলো। হয়তো সেটাকে 'ঘটনা' বলাই ভুল, কেননা কথাটার মধ্যে একটা সমাপ্তির ভাব আছে, আর আসলে সেটা হয়তো এখনো ঘটছে, রোজ ঘ'টে যাচ্ছে, কোনোদিন শেষ হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটা খেলার মতো ব্যাপারটা, এবং খেলাটাই আসল—কেন, কার জন্য, সে-সব কথা অবান্তর। আর তাই, এই খেলায় যে তাঁকে প্রথম নামিয়েছিলো, সেই মানুষটি প্রায় মুছে গেলো তাঁর মন থেকে, তার আসল নাম তিনি ভুলে গেলেন, তাঁর নিজের দেয়া 'এষা' নামটিও ভুলে গেলেন। আর সেই লুপ্ত লিপিখানা, যা তাঁর স্মরণে অঙ্কিত ব'লে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন, তাও আর মানসচিত্র হ'য়ে ঘন-ঘন ধরা দেয় না তাঁকে; অনেক নিদ্রাহীন রাত কাটাবার পর এখন বালিশে মাথা ঠেকানোমাত্র তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, এক ঘুমে রাত ভোর হয়; স্বপ্নে মাঝে-মাঝে ফিরে যান তাঁর ছেলেবেলায়, কখনো বা দ্যাখেন তাঁর মায়ের মুখ, যিনি আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে মৃত। এমনি সুখে বিরূপাক্ষর জীবনের শেষ বছরটি কাটলো।

৮

চৈত্র মাসের একটি সকাল। রাতভোর সুনিদ্রার পর বিরূপাক্ষ এইমাত্র জেগে উঠেছেন। জেগেছেন, কিন্তু বিছানা ছাড়েননি, চোখও খোলেননি। কেন জানেন না, আজ জেগে ওঠামাত্র তাঁর অসাধারণ সুখী মনে হচ্ছে নিজেকে, শুয়ে-শুয়ে সেই অনুভূতিটুকু উপভোগ করছেন, আধো ঘুমে, চোখ না-খুলে। তাঁর পাৎলা চুলগুলি নাড়িয়ে দিচ্ছে ফুরফুরে হাওয়া—ইলেকট্রিক পাখার নয় (স্পষ্ট টের পেলেন তিনি), বাইরের বাতাস, সমীরণ, মলয়সমীরণ। ঐ 'মলয়সমীরণ' কথাটাকে যেন জিভ দিয়ে

চাখলেন একবার, ঈষৎ কৌতুকের ধরনে, হঠাৎ যেন লবঙ্গের সুবাস পেলেন, তারপর সেই গন্ধ জয়দেবের কয়েকটি মসৃণ অনুপ্রাসে অনূদিত হ'য়ে গেলো। খাবার ঘর থেকে মেয়েলি গলার আওয়াজ ভেসে এলো— তাঁর মনে পড়লো বাড়ি আজ ভরা, খুকু আর অসিত কাল রাত্রে এসে থেকে গিয়েছিলো, এক ভাই-ঝি বেড়াতে এসেছে ভাগলপুর থেকে— ঠিক বেড়াতেও নয়, তার মা-বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন সুহাসিনীর কাছে, যাতে চারদিকে তল্লাশ ক'রে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করা যায়—'বি. এ. পাশ ক'রে ব'সে আছে মেয়েটা!'—আর ইতিমধ্যেই অসিতের ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে অনুরাগের পথে কিঞ্চিৎ এগিয়েও গেছে মেয়েটি। বাড়ির লোকেদের মুখগুলি একে-একে মনে পড়লো বিরূপাক্ষর—কী ভালো, কী ভালো ওরা সবাই—আমি সত্যি বোধহয় অসিতের উপর কিছু অবিচার করেছি, মাঝে-মাঝে দুঃখ দিয়েছি সুহাসিনীকে, লীলাকে—তবু ওরা কত ভালোবাসে আমাকে—আশ্চর্য! তাঁর ভাবতে ভালো লাগলো যে ওদের সকলকে নিয়ে, সকলের সঙ্গে তিনি বেঁচে আছেন, ভাবতে ভালো লাগলো যে ভাই-ঝির শিগগিরই বিয়ে হবে, আবার দুটি মানুষ নতুন ক'রে আবিষ্কার করবে সেই চিরপুরোনো রহস্য, আবার আসবে ঘাসের মতো শিশুরা, পৃথিবীর যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে। খুকুর বিয়েতে, দেবুর বিয়েতে আমি কিছুটা নির্লিপ্ত ছিলুম, কিন্তু এবারে রীতিমতো কন্যাকর্তা সেজে অভ্যর্থনা করবো অতিথিদের, খাওয়ার সময় ঘুরে-ঘুরে তদারক করবো। টুংটাং শব্দ—চা সাজানো হচ্ছে—একে-একে এবার উঠে পড়বে সবাই, চায়ের টেবিল সরগরম ক'রে তুলবে। নাৎনির গলার আওয়াজ কানে এলো তাঁর—'দিদানি, তুমি আমার অমলেটটা ক'রে দিয়ো—কেমন?' দিদানি নিজের হাতে না-করলে অমলেট ওর মুখে রোচে না, সেটা যদি কখনো পুড়েও যায়, তবু মুখে দিয়ে বলে, 'চমৎকার!' কী মিষ্টি হয়েছে দেবুর মেয়েটা, বড়ো হ'তে-হ'তে রীতিমতো সুন্দরী হবে মনে হয়। তাঁর বোজা চোখের তলায় হঠাৎ একটি মুখ

ভেসে উঠলো—নারীর মুখ—মুখের তলায় দেহ আকৃতি নিলো। ধীরে-ধীরে—কে? আমি কোথায় এলাম? সমুদ্র, দিগন্ত থেকে দিগন্তে অফুরান, ঢেউয়ের পরে ঢেউ অফুরান, ছুটে আসছে নীলের উপর ফেনিল, অনবরত ভাঙছে আর ফিরে আসছে—আর তারই তীর ধ'রে-ধ'রে হেঁটে যাচ্ছে সেই নারী, স্বচ্ছবসনা, বিজয়িনীর মতো ভঙ্গিতে, প্রতি পদক্ষেপে যৌবনের দ্যুতি ছিটিয়ে, বিশাল আকাশের তলায়, যেন সূর্যের আলোকে তার গাত্রবাস ক'রে নিয়ে, আর সমুদ্রকে তার সাক্ষী। আমি কি এ-রকম একটি দৃশ্য সিনেমায় কখনো দেখেছিলাম? না কি এমন কেউ, যাকে আমি চিনতাম, দেখেছিলাম কখনো? কে হ'তে পারে, নাম কী? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো—মধুবালা। মধুবালা···মধুমালা··· মধুমতী··· অন্য কোনো নাম কি ছিলো না? কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও অন্য কোনো নাম তাঁর স্মরণে এলো না, নারীটিকে ঠিকমতো শনাক্ত করা অসম্ভব মনে হ'লো, অথচ এই ধারণাটি ক্রমশ আরো জোরালো হয়ে উঠলো যে একে তিনি চিনতেন, দেখেছিলেন কখনো। তাঁর দৃষ্টির সবটুকু শক্তি তিনি সংহত করলেন সেই যুবতীর উপর—তাঁরই দিকে আসছে সে, এখন বেশি দূরেও নেই, কিন্তু সেই অল্প দূরত্বটুকু কিছুতেই যেন পেরোনো যাচ্ছে না, মেয়েটি গতিশীল হ'য়েও কী ক'রে অমন নিশ্চল হ'তে পারে, সে-কথা ভেবে তাঁর অবাক লাগলো। আর তারপর দেখলেন, কোনো নারীমূর্তি আর নেই, সমুদ্র আর আকাশ মিলিয়ে গেছে, তার বদলে একটি অক্ষর ফুটে উঠেছে তাঁর চোখের সামনে, অন্ধকার পটের উপর উজ্জ্বল একটি সংকেত। আর সঙ্গে-সঙ্গে কেমন একটা অস্বস্তি নামলো তাঁর শরীরে, বুকের ভিতরটাতে টান পড়ছে যেন, আর তারপর এক অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর যেন দম আটকে এলো। সারি-সারি অক্ষর—শ্রেণীবদ্ধ, সুবিন্যস্ত—চারদিক থেকে ঘিরে আছে তাঁকে, একদল সৈন্য-যে-ভাবে শত্রুর দুর্গ দখল ক'রে নেয়, তেমনি সুশৃঙ্খলভাবে। সেই সব অক্ষর—এবারে তাঁর মনে প'ড়ে গেলো—তাঁর বহুকালের চেনা···তাঁর

অচেনা··· কিন্তু এখন আর অচেনা নেই। অক্ষরগুলি যেন নিজে-নিজেই প্রবিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর মধ্যে—ছড়িয়ে পড়ছে বীজাণুর মতো তাঁর রক্তের স্রোতে, মেরুদণ্ডের মজ্জায়, তাঁর মাংসের মধ্যে বিঁধে যাচ্ছে ছুঁচের মতো, তাঁর প্রতি রোমকূপে সাড়া তুলছে তাদের অর্থ, ভাব, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। 'আ! এতদিনে! তাহ'লে—সত্যি, সব সত্যি!' তিনি চাইলেন শব্দ ক'রে কথাটা বলতে, কিন্তু ক্ষীণ একটু কাশির মতো আওয়াজ শুধু তাঁর কানে পৌঁছলো। মনে হ'লো এই অতর্কিত আক্রমণে তিনি যেন ভাঁজে-ভাঁজে খুলে যাচ্ছেন, ব'য়ে যাচ্ছেন· সমতলে-নামা ঝর্নার মতো দিকে-দিকে—সকলের দিকে, সকলের জন্য ভালো-বাসার ভারে আরো বড়ো হ'তে-হ'তে দূর-দূরান্ত পেরিয়ে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছি? এই প্রশ্ন তাঁর মস্তিষ্কে ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেলো। আনন্দ—এক অকল্পনীয় আনন্দে তিনি আচ্ছন্ন;—আনন্দ, যন্ত্রণার মতো অসহ্য, তাঁকে চূর্ণ ক'রে দিচ্ছে, হৃৎপিণ্ড ভীষণভাবে স্পন্দিত হচ্ছে, যে-সমুদ্র একটু আগে তাঁর চোখ থেকে হারিয়ে গেলো, এখন তা-ই গর্জন করছে তাঁর কানে, কিন্তু অর্থহীনভাবে নয়, তিনি যেন তারই মধ্যে আবির্ভূত অক্ষরগুলির শব্দরূপ শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু তখনও তাঁর চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি; একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা তিনি অনুভব করলেন—যদিও ঠিক ঠাওরাতে পারলেন না সেটা কি মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, না তৃষ্ণানিবারণের, না কি—এইমাত্র তিনি যা জানলেন, তা লিখে রাখতে চান অন্যদের জন্য? তাঁর শরীর উঠে বসার জন্য ন'ড়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে পুত্রবধূ তাঁর প্রাতঃকালীন চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো, বিরূপাক্ষর মাথা বালিশ থেকে স'রে এসেছে, একটা পা ঝুলে আছে খাটের বাইরে, তাঁর দেহ নিস্পন্দ, মুখে শান্তি, আর তাঁর ঠোঁটের রেখা দেখে মনে হয় তিনি যেন কিছু বলতে চান।

অ নু ষ্কা র ণী য়

কখনো ঢালু, কখনো চড়াই, ভুটিয়াদের পায়ে-পায়ে তৈরি, আঁকাবাঁকা, বার্চ ওক মেহগনির ফাঁকে-ফাঁকে সান্ধ্য সোনালি জাল-ছড়ানো, ঠাণ্ডা সবুজ গন্ধে-ভরা বনপথ—ওরা নিয়ে এলো তাঁকে একটি বিশৃঙ্খল বাগান পেরিয়ে, বনের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে লুকোনো এক অপেক্ষমাণ ও নির্ধারিত বাংলোয়।

দরজার ধারে চোখোচোখি হ'লো দু-জনের: এক বৃদ্ধ, গলার চামড়া ঢিলে, মোটা পশমি কোটের তলায় হলদে রঙের মাফলার গোঁজা, আর একটি প্রায়-চল্লিশ যুবক, ছিপছিপে টান শরীর, পাৎলা ঠোঁট, চোখে চশমা, কোমর ছাড়িয়ে নামানো একটি পুরো-হাতার সোয়েটার গায়ে।

ভিতরে একটি লম্বা, সরু চতুষ্কোণ ঘর, কাঠের মেঝে আবরণহীন, জানলার বাইরে সূর্যাস্তের আভা, লম্বা, সরু চতুষ্কোণ একটি টেবিলের তলায় লোহার উনুনে কাঠকয়লার আগুন, আর উপরে চায়ের সরঞ্জাম, দার্জিলিঙের বিখ্যাত বিয়াঙ্কার নাম-ছাপানো দুটো কাগজের বাক্স, একটি লম্বা কাচের গ্লাশ, একটি কাচের জগে পানীয় জল, এক বোতল ব্যালেনটাইন হুইস্কি।

বৃদ্ধটি প্রথম কথা বললেন, 'অমিত, তুমি?'

'অনেকদিন পর দেখা হ'লো। আমি কথা বলতে চাই, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই,' অস্থিরভাবে, দ্রুত উচ্চারণে বলতে লাগলো যুবকটি। 'কিন্তু আপনি বোধহয় অতটা পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়েছেন? বসুন। এই এখানটায়—আগুনের কাছে, ওটা আপনারই জন্য। মাফলারটা খুলে রাখবেন নাকি? দেখতে পাচ্ছেন, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশ কেমন গোলাপি-লাল? সন্ধ্যা: আপনার প্রিয় সময়। হেমন্ত: আপনার প্রিয় ঋতু। দার্জিলিং আর ঘুমের মধ্যে, এখান থেকে দূরে নয়, অসাধারণ সুন্দর দু-একটা দৃশ্য আছে।' হঠাৎ থেমে গেলো যুবকটি, একটু যেন লজ্জা পেয়ে। বৃদ্ধের দিকে আর-একবার তাকিয়ে বললো, 'ঐ হ্যারিস-টুইডটা আপনাকে ন্যুয়র্কে পরতে দেখেছিলাম না? ঐ

হলদে মাফলারটাই কি মেট্রপলিটান অপেরায় হারিয়ে গিয়েছিলো একবার ?'

বৃদ্ধটি হেসে বললেন, 'জামাকাপড় বিষয়ে তোমার স্মরণশক্তি তো অসাধারণ।'

'আপনার বিষয়ে আমার স্মরণশক্তি বরাবরই অসাধারণ। আমি যখন স্কুলে পড়ি আপনার লেখা থেকে মুখস্থ ব'লে যেতে পারতাম—শুধু কবিতা নয়, পাতার পর পাতা গদ্য। আপনার প্রথম তিনখানা বইয়ের অনেক কবিতা এখনো আমি আউড়ে যেতে পারি। কিন্তু ইদানীং আপনার লেখা আর পড়ি না। গত দশ বছরে যা-কিছু বেরিয়েছে আপনার, তার কিছুই আমি পড়িনি। ইচ্ছে ক'রেই পড়িনি। কখনো পড়বোও না।'

'অতবার বলছো কেন ? আমার তো আর এ-বয়সে স্বীকৃতি শোনার প্রয়োজন নেই—বিশেষত তোমার মুখ থেকে।'

'আপনার অহমিকা উপভোগ—বিশেষত, আমার পক্ষে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এর পরে আমি যা বলবো তাও আপনার আত্মশ্লাঘাকে খাদ্য জোগাবে। অন্তত আপনি তা-ই অর্থ ক'রে নেবেন কথাগুলোর—যেহেতু আপনি কোনো-কোনো বিষয়ে অন্ধ, কোনো-কোনো বিষয়ে বধির, কোনো-কোনো বিষয়ে ভীত। তা না হ'লে চলে না আপনার। কিন্তু তবু—আমি না-ব'লে পারছি না। আমি অনেকদিন ধ'রে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য। কয়েকটা কথা বলার জন্য। এতদিনে সুযোগ পেলাম।'

বৃদ্ধটি আস্তে-আস্তে বললেন, 'তাহ'লে আমার ট্যাক্সির চালক তোমাদেরই লোক ছিলো ?'

'সার্থক আপনার বহুবচনের ব্যবহার,' চশমার পিছনে যুবকের চোখ দুটি হাসলো। 'হ্যাঁ—"আমরা"। আমাদের মধ্যে "আমি" ব'লে কেউ নেই। ঘুমের যে-দোকানে আপনি অর্কিড কিনলেন, তার মালিক—

উদ্ভিদবিদ্যায় বিশারদ ও সদালাপী লোকটি—সেও "আমরা"। দার্জিলিঙে আপনার ওয়েভার্লি হোটেলের সুদর্শন বাঙালি ম্যানেজারটিও তাই। আপনার ট্যাক্সি হঠাৎ বিগড়ে গেলো, সারাতে দেরি হবে ; "আমরা" আপনাকে বিশ্রামের জন্য নিয়ে এলাম এখানে। আপনি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন ?'

'তাহ'লে তুমিও মানো যে অবস্থাবিশেষে একবচন অনিবার্য ?'

'অন্তত দুর্নিবার, অন্তত দুর্মর। তার উদাহরণ তো আপনি। অবাক হয়েছিলেন ?

'তুমি আর আমাকে অবাক করতে পারবে না, অমিত। কে না জানে, জগৎকে যারা বদলে দিতে চায়, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব।'

'সবই··· ?' হঠাৎ একটা ছায়া পড়লো যুবকটির মুখে, ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'কিন্তু আমি আমার প্রাথমিক কর্তব্য ভুলে যাচ্ছিলাম। সামান্য আয়োজন করেছি আপনার জন্য—' টেবিলে সাজানো জিনিশ-গুলোর উপর চোখ ফেললো সে। 'আপনি ন্যুয়র্কে ব্যালেনটাইন খেতেন না ?'

বৃদ্ধটি মৃদুস্বরে বললেন, 'এ-দেশে ব্যালেনটাইন! মারাত্মক দাম। কী দরকার ছিলো ? আর এ-মুহূর্তে আমার চায়ের জন্যই তেষ্টা পেয়েছে।'

'ভাবলাম, আপনাকে অতিথিরূপে পাবার সৌভাগ্য আর যদি আমার না হয়—' যুবকটি মুখ নিচু ক'রে চা ঢালতে লাগলো। 'আপনার চিনি তো এক চামচে ? চা ভালো ? একটা স্যাণ্ডুইচ চেখে দেখবেন না ? এটা হ্যাম, এটা চিকন, এটা কাভিয়ার।'

'কাভিয়ার! তুমি করেছো কী ?'

'সেবারে আমি যখন মস্কোতে গেলাম, আপনি আমাকে কাভিয়ার আনতে বলেছিলেন ; ফেরার সময় তাড়াহুড়োয় আমার মনে ছিলো না।'

'মনে ছিলো না, সেইটে মনে রেখেছো। অনিন্দ্য তোমার আতিথেয়তা, অমিত।'

'আমার আতিথেয়তা এখনো আরম্ভ হয়নি।' যুবকটি দরজার দিকে তাকালো ; একটি নেপালি এসে টেবিলে রাখলো ঢাকনা-পরানো কেরোসিন-ল্যাম্প, জানলায়-জানলায় পর্দা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ছু-জনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলো : নিঃশব্দে কাটলো কিছুক্ষণ। বন্ধ ঘরে, লণ্ঠনের আলোয়, ঠাণ্ডা পার্বত্য রাতের শ্রুতিগম্য স্তব্ধতার মধ্যে, দার্জিলিং-চায়ের সৌরভ নিশ্বাসে টেনে নিতে-নিতে, কথা না-ব'লেও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো মানুষ ছুটি ; এক ছিপছিপে টান-চামড়ার জ্বলজ্বলে যুবক, আর মেদ-ঝ'রে-যাওয়া শীর্ণ এক বৃদ্ধ।

খালি পেয়ালাগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে যুবকটি বললো, 'এবার আপনার চুল কিছুটা শাদা দেখছি।'

বৃদ্ধ সহাস্যে বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছি সেই দিনের জন্য যেদিন আমার সব চুল শাদা হ'য়ে যাবে।'

'তা নাও হ'তে পারে, তা নাও হ'তে পারে,' নিচু গলায় ছু-বার বললো যুবকটি। 'শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলি। আমার যত শত্রু আছে পৃথিবীতে—পার্লামেণ্ট, প্ল্যানিং কমিশন, সুপ্রীম কোর্ট, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র—সবচেয়ে বড়ো শত্রু হলেন : আপনি!'

'ষোলো বছর বয়সে আমার কবিতা প'ড়ে তোমার চোখে জল এসেছিলো, সেজন্য এখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারছো না ?'

'চতুর আপনি—আমার এই লজ্জার কথাটা মনে রেখেছেন। হ্যাঁ—চোখে জল! যখন মেদিনীপুর বন্যায় বিধ্বস্ত, বাঁকুড়া জেলায় মায়েরা তাদের সন্তান বেচে দিচ্ছে, আর যখন কলকাতায় হাজার ফুটপাতে মাছির মতো ম'রে যাচ্ছে মানুষগুলো—খেতে না-পেয়ে, শুধু খেতে না-পেয়ে!—আমার তখন কবিতা প'ড়ে চোখে জল এসেছিলো। ছন্দের আনন্দ, ভাষার মাদকতা, প্রেমের বেদনা, বেদনার গৌরব, আর এক ব্যাপ্ত, বিলাসী বিষাদ—ধূসর নয়, বহুবর্ণরঞ্জিত ; বন্ধ্যা নয়, স্বপ্নগর্ভ ; এই সব তীব্র বিষ আমি পান করেছিলাম আপনার বইয়ের পাতা

থেকে—শুধু আপনারই নয় অবশ্য, কিন্তু আপনিই প্রথম আমার জীবনে, আমার কাছে প্রথম অপরাধী আপনি। দশ বছর—আমার যৌবনের প্রথম দশ বছর—আমার সবচেয়ে সক্ষম, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বছরগুলি—আমি নষ্ট করেছি স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, আপনারই পরামর্শে, বিনায়ক দত্ত!'

বৃদ্ধ বললেন, 'অতটা নাটকীয়তা নিষ্প্রয়োজন, অমিত। আস্তে বলো।'

'আপনি বাধা দেবেন না, আমাকে বলতে দিন। আমার ঐ "অমিত" নামটা—প্রাগৈতিহাসিক "শেষের কবিতা"র অবদান; ঐ এক অভিশাপ ছিলো আমার জীবনে, যেন জন্ম থেকেই আমাকে কবিতার ল্যাজে বেঁধে দেয়া হ'লো।'

'তোমার চিত্রকল্প সুচিন্তিত হ'লো না। কবিতাকে লাঙ্গুলধারী জীব ব'লে কি কল্পনা করা যায়?'

'কেন, পেগেসাস! গ্রীকদের পক্ষীরাজ ঘোড়া!'

'চমৎকার বলেছো!' হাতে তালি দিয়ে, পিছনে মাথা হেলিয়ে, সশব্দে হেসে উঠলেন বিনায়ক দত্ত। অমিত একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'অনেকদিন পর আপনার হাসি শুনলাম।' আর-একবার তাকালো সে বৃদ্ধের দিকে, লণ্ঠনের আলোয় অনেক শাদা দেখতে পেলো তাঁর চুলে—সে প্রথমে যা ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। 'কিন্তু সেই বাঁধন আমি ছিঁড়ে দিয়েছি,' আবার দ্রুতবেগে সে বলতে লাগলো—'পেগেসাস, সরস্বতী, সাফো, লি-পো, বাল্মীকি; এঁরা সবাই আজ মৃত আমার কাছে—মৃত, পাতালবাসী, অস্তিত্বহীন। বলা বাহুল্য, আপনিও তা-ই। মানুষের কান্না আমার কানে পৌঁচেছে, কোনো কবিতা আর আমাকে কাঁদাতে পারবে না। আপনি কি জানেন সে-কান্না কী? "বৃথা এ-ক্রন্দন, বৃথা এ-অনলভরা দুরন্ত বাসনা।"—তা নয়, তা নয়! ক্ষুধিতের চীৎকার, উৎপীড়িতের আর্তনাদ, বঞ্চিতের বিক্ষোভ, বিদ্রোহের

গর্জন। আপনি কি তা শুনেছেন কখনো, বিনায়ক দত্ত? অপদার্থ, অক্ষম, আত্মমগ্ন সব ভাবুকের মন আপনি অফুরন্তভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আপনার উপন্যাসে, আয়নার সামনে ব'সে তৃপ্তিহীনভাবে নিজেরই প্রতিকৃতি এঁকেছেন—কিন্তু সত্যিকার মানুষকে কখনো দেখতে পাননি। অথচ আপনি কিনা এতই সংবেদনশীল যে ছাপার অক্ষরের দশ পাতা জুড়ে বর্ণনা করতে পারেন ঘুম থেকে তন্দ্রা পেরিয়ে পুরো জেগে ওঠার তিন মিনিট সময়! আপনার কি মনে হয় আপনি ক্ষমার যোগ্য?'

বৃদ্ধটি মৃদুস্বরে বললেন, 'অত ক্রোধ কেন, অমিত? তুমি তো তোমার ইউনাইটেড নেশন্সের চাকরি ছেড়ে দিয়েছো—আর তো তোমার বিবেকপীড়া নেই।'

'না, নেই! সেইজন্যেই আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি আপনার সামনে; সেইজন্যই আজ সন্ধ্যায়, ঘুম আর দার্জিলিঙের মধ্যপথে এই নির্জনতায়, আপনার সঙ্গে আমার এই রঁদেভু। আমার চাকরি—শুধু দেশে-দেশে ফোঁপরদালালি ক'রে বেড়াবার জন্য ট্যাক্সো-ছুট পাঁচ হাজার ডলার মাইনে; আমার কাডিয়াক আর মার্সিডিজ-বেনৎস; হেস্টিংসে গঙ্গার ধারে আমার বাগান-ঘেরা বাড়ি; প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, তারপর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনে আমার লজ্জাকর কৃতিত্ব; এমনকি আমার স্ত্রী, আমার দশ বছরের মেয়ে, আমার বৃদ্ধ বিপত্নীক বাবা—সব আমি ত্যাগ করেছি। রেখেছি শুধু মনের মধ্যে এক অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ, যা একদিন সারা পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে—কিন্তু প্রথমে এখানেই, এই দীনতম, বুভুক্ষুতম ভারতবর্ষে। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না; আমি আপনাকে বিপ্লবের তুবড়ি ছোটাতে বলছি না, উপকারী গণ-সংযোগের জন্য তিব্বতসীমান্তে রাস্তা খুঁড়তেও পাঠাতে চাচ্ছি না। আপনি আমার পক্ষে আপোশের অতীত, আমার বিপরীত ব'লেই শ্রদ্ধেয়। আমি চরমপন্থী—আপনারই মতো; আমি ঐকান্তিক—আপনারই মতো—

অন্তত তা-ই হ'তে চাচ্ছি। আপনি জীবন ভ'রে বৈরীবেষ্টিত হ'য়েও যে-ভাবে দুর্গ রক্ষা করেছেন, ঠিক সেইভাবে—আমি আজ প্রস্তুত। কিন্তু—আমার দুর্গের আয়তন আপনার কল্পনাতীত, আমার শত্রুর সংখ্যা আপনার কল্পনাতীত, আমার অস্ত্রাগার আপনার কল্পনাতীত। আপনার সঙ্গে আমার ব্যবধান মেরুপ্রতিম।'

বৃদ্ধটি মৃদুভাবে ন'ড়ে উঠলেন একবার, একবার যুবকটির দিকে সূক্ষ্ম চোখে তাকালেন, যেন সে যা বলতে চাচ্ছে তা সঠিকভাবে বুঝে নেবার জন্য—তারপর, যেন কিছু-একটা করার জন্যই পিঠ বেঁকিয়ে টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়ালেন। অমিত তা লক্ষ ক'রে তক্ষুনি হুইস্কি ঢেলে তাঁর সামনে রাখলো। 'জল নেবেন তো? এই ঠিক? ...' নিচু হ'য়ে উনুনটার গায়ে হাত রাখলো একবার। 'আপনার শীত করছে না তো?'

'সব ঠিক আছে। চমৎকার। বলো। তোমার কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে।'

'ভালো লাগছে?' যুবকটির ঠোঁটে বিদ্রূপ ঝলক দিলো। 'আপনি বোধহয় এতেও কবিতা দেখতে পাচ্ছেন? মানুষের মুক্তি—ক্ষুধা আর দাসত্ব থেকে মুক্তি—এও বোধহয় একটা কবিতা আপনার কাছে?'

'আ মি কথাটা বলিনি; তুমিই বললে।'

হঠাৎ একটু লাল হ'লো যুবকটি; কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটলো।

'দেখছি আপনি না-বোঝার ভান করছেন,' নিচু গলায় আরম্ভ করলো অমিত, 'আমাকে সব কথাই খুলে বলতে হবে। তাহ'লে শুনুন: আমি ধ্বংস চাই। ধ্বংসের পথে মুক্তি: এই আমার স্লোগান। ম্যান-হাটান স্কাইলাইনের ধ্বংস, ক্রেমলিনের নিপাত, লণ্ডন পার্লামেণ্টের পতন, পৃথিবীর সব স্বর্গপুরীর উচ্ছেদ, বৈজয়ন্তধামের অবলোপ। যেখানেই ক্ষমতা জ'মে উঠেছে, সেখানেই বোমা, আগুন, ডিনামাইট। সব সংঘ, সমিতি, রাজনীতি, জনহিতৈষণা—সব প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস। রাষ্ট্রের ধ্বংস।

সমাজের ধ্বংস। দাস আর অত্যাচারী, বধ্য আর ঘাতক—কতবার এরা স্থানবিনিময় করলো ইতিহাসে—শুধু স্থানবিনিময়!—আমি সেই সম্পর্কটারই বিলুপ্তি চাই। চাই সেই নতুন পৃথিবী, যেখানে কেউ থাকবে না নেতা বা জনগণ, কমিসার বা কমরেড, ভোটপ্রার্থী বা ভোট-দাতা, শাসক বা শাসিত—থাকবে শুধু মানুষ, নির্মল, সুখী, স্বাধীন ও বিকশিত মানুষ।—আপনার ঠোঁটে কৌতুক দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার পরের কথাটাই প্রমাণ করবে যে এটা আমার অবাস্তব কল্পনা নয়, আমার কর্মসূচিও প্রস্তুত। অন্য সব-কিছুব আগে—প্রাথমিক পদক্ষেপস্বরূপ—আমি চাই—' মুহূর্তকাল থামলো যুবকটি, মুখ থেকে ছুঁড়ে বের ক'রে দিলো কথাটা: '—কবিতার ধ্বংস। কবিতা—যা মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে, সম্মোহন আনে হৃদয়ে, উপহার দেয় অলীক এক আনন্দ, জগতের সঙ্গে এক ভ্রান্ত ঐক্যবোধ; যা কখনো-কখনো এমনও ভান করে যেন সব অন্যায়ের তা ক্ষতিপূরণ—সেই সর্বনাশী কবিতার আমি প্রথমেই ধ্বংস চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার ঠোঁটে একটি কথা উঠে আসছে, আমি জানি সেই কথাটা কী— আর—দুঃখের বিষয়, মানিও; কবিতার ধ্বংস অসম্ভব। হ্যাঁ, আমি জানি।' অমিতের কণ্ঠস্বর ক্রমশ উঁচু পর্দায় উঠতে লাগলো, 'যখন নবাগত দুর্ধর্ষ শ্বেতাঙ্গরা অনার্য-রক্তে গাঙ্গেয়ভূমি প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে তখনই হয়তো রচিত হচ্ছিলো ঋগ্বেদ; যখন অভিদ তাঁর মনোমুগ্ধকর পুরাণকাহিনী লিখছেন, রোমে তখন ক্রীতদাসেরা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সিংহের মুখে; ফ্লরেন্সে যখন যীশুর নাম ক'রে ঝাঁকে-ঝাঁকে জ্যান্ত মানুষ পোড়ানো হচ্ছে, ঠিক তখনই লেওনার্দো তাঁর মনা লিসার ধ্যানরূপে তন্ময়; ইংলণ্ডে যখন কয়লা-খনির গুহার মধ্যে জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে পিঠের উপর বোঝা টেনে নিয়ে যাচ্ছে আটমাস-অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকেরা, তখনই বিলিয়ম ওঅর্ডস্বার্থ তাঁর পুষ্পপক্ষীদের বন্দনায় মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন। আর রিলকে—আপনার প্রিয় কবি—প্রথম যুদ্ধের পরে জর্মানি যখন বিধ্বস্ত, এক টুকরো

চকোলেটের দামে বিকিয়ে যাচ্ছে যুবতী মেয়ে, রিলকে তখন সচ্ছল সুইৎসার্লণ্ডের পল্লীধামে ব'সে কান পেতে আছেন দেবদূতের পাখার শব্দ শোনার জন্য।... কিন্তু অত দূরে যাবারই বা দরকার কী, আমাদের রবীন্দ্রনাথকেই ধরা যাক। আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে আমরা যখন ইংরেজ শাসনের কলঙ্কদুঃখে ডুবে গিয়েছি, সেই মুহূর্তেই ধ্বনিত হ'লো "সন্ধ্যাসংগীত"—"বিদ্রোহী এ-হৃদয় আমার জগৎ করিছে ছারখার।"— এমন কথা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আর কবে শোনা গিয়েছিলো! জগৎ—অসংখ্য মানুষের সংসারযাত্রা, অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখ: তা যেন শুধু একটিমাত্র হৃদয়ের ইচ্ছার অধীন। কী দুঃসাহস! কী দম্ভ! কী-নির্লজ্জ স্পর্ধা!'

'তোমারও তা-ই,' খুব মৃদুস্বরে, প্রায় মনে-মনে বললেন বিনায়ক; অমিতের তা কর্ণগোচর হ'লো না। 'আমি যদি রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হতাম,' নিশ্বাস ফেলে সে তখনই আবার বলতে লাগলো, 'তাহ'লে আমি বলতাম যে কবিতাই মানুষের সেই সহজাত, দুর্জয় আদিপাপ, ভগবানের করুণা ভিন্ন যা থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু যেহেতু আমার ধর্মে ভগবানকে সসংকোচে দাঁড়াবার মতো ইঞ্চিখানেক জায়গাও আমি দিতে পারি না, যেহেতু আমার অবলম্বন শুধু পুরুষকার, তাই এই পাপক্ষালনের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। আমি ভেবে দেখেছি কবিতার অবলোপ যদি অসম্ভব হয়, তাহ'লেও আমার হতাশ হবার কারণ নেই; আমি অন্তত প্রতীকীভাবে তাকে হত্যা করতে পারি। আর তাই—' যুবকটির গলা নিচু হ'তে-হ'তে প্রায় বাতাসে মিলিয়ে গেলো—'তাই আপনার জন্য আমার এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা।'

যুবকটি থামলো; তার ঠোঁটের কোণে এক বিন্দু ফেনা বৃদ্ধটি লক্ষ করলেন। এতক্ষণ, মাঝে-মাঝে হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে, নিঃশব্দে ব'সে ছিলেন তিনি; এবারে একটি নিচু, নরম হাসি বেরোলো তাঁর গলা দিয়ে।

'তুমি ভুল করছো। আমার কবিতা অত ভালো নয়। আমি প্রতীক হ'তে পারি না।'

'কিন্তু আপনি হলেন—যাকে বলে টিপিক্‌ল্‌, আদিপাপের সব লক্ষণ আছে আপনার মধ্যে। বহুকাল ধ'রে চর্চার ফলে এখন এমনকি আপনার মুখের রেখাতেও তা পরিস্ফুট। আপনার হিতৈষীরা মাঝে-মাঝে চেষ্টা করেছে আপনার সংশোধন ঘটাতে ; কিন্তু আপনি থেকে গেছেন অনুতাপরহিত, অনুদ্ধারণীয়। যত আক্রমণের ঝড় উঠেছে আপনার বিরুদ্ধে, আপনি প্রতিবার তার উত্তর দিয়েছেন আরো একটি বই লিখে, যাতে কেউ-কেউ বলে, আপনি আরো আশাহীনভাবে নিজেকে আরো গভীরভাবে অভিযুক্ত করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি ভুলে যাননি আপনার কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি জাগাবার আশায় কত লোক কতই না পরিশ্রম করেছে? রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকীর বছর কেমন র'টে গেলো যে ছ গোল সরকার আপনাকে ভাড়া ক'রে প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিলো—আর-কোনো কারণে নয়, ভারতের "জাতীয় কবি"র অপবাদ রটাবার জন্য! আর তারপর এই সেদিন ''ওসীয়া'' নিয়ে হৈ-চৈ—আপনি শুনছেন ?"

বৃদ্ধটির থুৎনি তাঁর বুকের কাছে নেমে এসেছিলো, মাথা হেলিয়ে অলসভাবে বললেন, 'ঐ আদ্যক্ষরগুলো আমার বড্ড গুলিয়ে যায়—এত ছড়াছড়ি আজকাল। "ওসীয়া" ব্যাপারটা কী বলো তো!'

'ব্যাপারটা হ'লো—' হালকা হাসি ফুটলো যুবকটির মুখে, 'ও. এস. ঈ. এ.—অপারেশন সাউথ-ঈস্ট এশিয়া। একটি আন্তর্জাতিক গুপ্তচর-সংঘ। এর উল্টো পক্ষে যে-সংস্থাটি আছে, তার নাম প্যানএশিয়া বা প্যানেসিয়া—সর্বরোগহর দাওয়াই। জগৎ জুড়ে এই খেলা চলছে।'

'আশ্চর্য! আমি যদি শুধু স্বপ্নবিলাসী কবি হই, অসংশোধনীয়ভাবে বাস্তববিমুখ, তাহ'লে কী ক'রে কোনো গুপ্তচর-সংঘের কাজে লাগতে পারি?'

'এতেই বোঝা যায় আপনার দেশের লোককে আপনি কত কম চেনেন! আপনি—অমার্জনীয় রবীন্দ্র-ভক্ত—লব্‌স্টার-শ্যাম্পেন ডিনার খেয়ে রবীন্দ্রনাথকে "অশিক্ষিত" ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, এও যদি কেউ বিশ্বাস করে—' হঠাৎ হো-হো শব্দে হেসে উঠলো অমিত, পরমুহূর্তে হাসি থেমে গেলো, রেখা পড়লো কপালে। 'কিন্তু আপনি কি এখনো বোঝেননি বাঙালিরা কত সহজে যে-কোনো কথা চেটে-পুটে খেয়ে নেয়—যদি তাতে মেশানো থাকে ঈর্ষার ব্রণক্ষরণ, কুৎসার দুর্গন্ধ। আমি জানি, আপনার সর্বনের সেই বক্তৃতায় সশরীরে উপস্থিত ছিলো "ট্রুথ" পত্রিকার বাণেশ্বর পাল, আর "সত্যযুগ"-এর তামস তলাপাত্র; কিন্তু কলকাতায় যখন পঞ্চাশটা কাগজ জোট বেঁধে আপনার গলা কাটছে, তখন ঐ দুই ব্যক্তি স্মৃতিশক্তি ও বাকশক্তি হারিয়ে জড়পদার্থে পরিণত হয়েছিলো। উদ্দেশ্য সাধু তাদের; স্বদেশবাসীকে পুঁজভক্ষনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চায়নি। এও আমি জানি যে "ওসীয়া"-অভিযানের প্রচ্ছন্ন নায়ক ছিলো অমরেশ বাগচী, যার প্রথম কয়েকটি কবিতাকে আপনি পঁচিশ বছর আগে আকাশে তুলেছিলেন। সেও ছিলো জনকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আর যারা রাত-বিরেতে বেনামি টেলিফোনে কুৎসিত কথা ছিটিয়ে দিতো আপনার আর সুপ্রিয়া দেবীর কর্ণকুহরে, তারাও অনেকে অনেকবার আপনাদের বাড়িতে আপ্যায়িত হ'য়ে গেছে।—কিন্তু আমি এদের ক্ষমা করতে পারি, জানেন; আমি সকলকে ক্ষমা করতে পারি—আপনাকে ছাড়া। যে-দেশে অধিকাংশ মানুষ স্বল্পাধিক অনাহারক্লিষ্ট, যে-দেশে অবস্থাপন্ন লোকেরাও অসাম্য ও আমলাতন্ত্রের চাপে বিকৃত হ'য়ে যায়, সে-দেশে কোনো কৃতী ও উন্নতশির পুরুষের বিরুদ্ধে ঈর্ষা বিদ্বেষ আক্রোশ তো অনিবার্য।—কিন্তু আপনি, আপনার কি কখনো ইচ্ছে করে না ঊর্ধ্বে উঠে যেতে; ইতরের ঈর্ষা, মূর্খের আক্রমণ, মলময় কণ্ঠনালী থেকে উদ্‌গিরিত পুরীষনিস্রাব—আপনার কি ইচ্ছে করে না

এ-সবের উর্ধ্বে উঠে যেতে, বাইরে চ'লে যেতে? আপনি কি কখনো একুশ শতকের কথা ভাবেন না? প্রার্থনা করেন না সেই মঙ্গলময় দিনটিকে, যেদিন আপনার দত্ত উপহার আর তার গ্রহীতাদের মধ্যে ব্যবধান হ'য়ে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না আপনার সজীব, শারীরিক উপস্থিতি, অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্যে গড়া আপনার ব্যক্তিত্ব?—ওঃ, আমার গরম লাগছে!' বেগে ঘুরে দাঁড়ালো অমিত, মাথার ওপর দিয়ে টেনে এক ঝটকায় সোয়েটারটা খুলে ফেললো। বৃদ্ধটির চোখে পড়লো তার হিপ্‌-পকেট থেকে বেরিয়ে-থাকা একটা কালো, ইস্পাতে তৈরি আকৃতি। চেয়ারের হাতল থেকে হলদে মাফলারটি তুলে নিয়ে গলায় জড়ালেন তিনি, আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার স্বগতভাষণ শুনলাম, বারান্তরে সংলাপ হবে। এতক্ষণে গাড়ি সারানো হ'য়ে গেছে নিশ্চয়ই?'

যুবকটি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো তাঁর মুখোমুখি, শান্ত গলায় বললো, 'দরজার ও-পিঠে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। বাগানের বাইরে। আপনি বয়স্ক ও মাননীয়; আপনার পক্ষে কায়িক সংগ্রামের চেষ্টা শোভন হবে না।'

বৃদ্ধ ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'ওরা মানে—"তোমরা"? কিন্তু আমি তোমাকে "তোমরা" ব'লে ভাবতে পারি না; তুমি আমার কাছে অদ্বিতীয়ভাবে অমিত বিশ্বাস।'

'সেইজন্যই, সেইজন্যই,' আপাতত অসংলগ্নভাবে উত্তর দিলো যুবকটি। 'তাই তো আপনাকে আজ প্রয়োজন আমার, অন্য সব-কিছুর উপরে আপনাকেই। আপনি কি এখনো ক্লান্ত হননি—আপনাকে ঘিরে জ'মে-ওঠা সব অবান্তরতায়, আবর্জনায়, অর্থহীন বিতর্কে; আপনাকে কি পীড়িত করে না পাঠকদের অমনোযোগ, আপনার শূন্যসার সমকালীন খ্যাতি? আপনার নিজের কথা জানি না, অন্য কারো কথা জানি না—কিন্তু আমি এখন আপনাকে দেখতে চাই বিশুদ্ধ

ও নির্দ্বন্দ্ব ; আমি চাই আপনাকে সেই ভাবীকালে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে, যখন আপনার সৃষ্টি হ'য়ে থাকবে না আপনারই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের দ্বারা সংশয়াচ্ছন্ন ও ধূমল ; যখন ধীরে-ধীরে আপনি উদ্ঘাটিত হবেন আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু পাঠকের কাছে ; আবিষ্কৃত হবে আপনার সব বক্রোক্তি, কূটোল্লেখ, প্রচ্ছন্ন আত্মজীবনী, প্রচ্ছন্ন আত্মসমালোচনা ; যে-রশ্মিজাল আপনি এক-একটি বিশেষণ থেকে বিকীর্ণ করেছিলেন, একই পঙক্তির মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন যে-সব উক্তি ও তার প্রতিবাদ। আমি বয়সে আপনার চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোটো; তাই আশা করছি আপনার সেই অবিমিশ্র আত্মপ্রকাশের আরম্ভ আমি দেখতে পাবো।'

স্তব্ধ—এক ভারি, বিরাট স্তব্ধতায় ভরা, কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দের মতো—এমনি কাটলো কিছুক্ষণ। বৃদ্ধ দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক আত্মহারা যুবক—উন্মাদ, হয়তো বিপজ্জনক, কিন্তু স্নেহের যোগ্য, করুণার যোগ্য ; আর যুবকটি যেন কুয়াশার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট-ভাবে দেখতে পেলো তার কুড়ি বছর আগেকার নিজেকে—সেই সব নষ্ট, সুঘ্রাণ, কবিতায়-আক্রান্ত দিন—এক বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে, জরাস্পৃষ্ট রেখায়, কোনো পুরোনো, হলদে-হ'য়ে-যাওয়া ছবির মতো। বৃদ্ধ একবার ডাকলেন, 'অমিত।'

যুবকটির কাঁধ ন'ড়ে উঠলো—হয়তো বিনয়ের, হয়তো অসহিষ্ণুতার ভঙ্গিতে। নিচু গলায় বললো, 'কিছু চাই আপনার ?'

'তুমি আমাকে যত বড়ো মূল্য দিলে তা আমার পক্ষে অভাবনীয়। এবার একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দাও।'

'আপনি ফিরে যেতে চান ? কিন্তু কোথায় বলুন তো ?' একটি ছোট্ট হাসি অমিতের ঠোঁট বেঁকিয়ে দিলো, ঝিলিক দিয়ে উঠলো শাদা, ভেজা দাঁতের সারি। একটুক্ষণ পায়চারি করলো অমিত—সে পিঠ ফেরানো মাত্র বিনায়ক তার হিপ্-পকেট থেকে বেরিয়ে-থাকা কালো চোঙাটি আবার দেখতে পেলেন—তারপর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে বলতে

লাগলো, 'কেন বললেন অভাবনীয়? যা-কিছু আপনি লিখেছেন জীবন ভ'রে, সব কি তাহ'লে বানানো কথা? সত্যি কি আপনি নিঃসঙ্গ ব'লে গর্বিত নন, বাইরের ঐ পাহাড়গুলোর মতোই যে-ভবিষ্যৎ সুদূর ও মস্ত বড়ো উঁচু, আপনি কি তারই গুহার মধ্যে অন্তরীণ নন তাহ'লে? কেন, এতদিন পরে, এই বৃদ্ধ বয়সে, নিজেকে আপনার কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান—শুধু বেঁচে থাকার জন্য, এক ক্ষুদ্র, সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য? ভেবে দেখুন, যে-দেবীর দর্শন আপনি পেয়েছিলেন তাঁর আঘাতে কত জীবনধ্বংস হ'য়ে গেছে—কত সুন্দর ও মহান সম্ভাবনা বিচূর্ণ—উন্মাদ হ্যেল্ডার্লিন, কোলরিজ আফিঙের নেশায় নিশ্চল, চোরাই কারবারে অবলুপ্ত র‍্যাঁবো। আর আপনি কী ক'রে আশা করেন সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে, আপনি কি কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত নন? আপনি ছোটো হ'য়ে যাবেন না, আমি আপনাকে যেমন দেখতে চাই, তেমনি বড়ো হ'য়ে উঠুন আপনি—এখনই, এই মুহূর্তে, আমার চোখের সামনে—পেরিয়ে যান সব সমকালীন সাংসারিক সীমা, সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলুন। আপনার কি ভয় করছে? আসুন, আমি আপনাকে সাহায্য করছি—' অমিত হাত বাড়ালো, যেন বৃদ্ধকে স্পর্শ করার জন্য, পরমুহূর্তে সেই হাতেরই এক ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ইস্পাতে তৈরি কালো যন্ত্রটি বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলো।

আবার নামলো নীরবতা। মুখোমুখি, লম্বা, সরু, চতুষ্কোণ, অবরুদ্ধ সেই ঘরটায়, লণ্ঠনের দুর্বল আলোতে, এক স্তব্ধ, হিম, পার্বত্য রাতের নির্জনতায়, লম্বা সরু চতুষ্কোণ টেবিলটার দু-দিকে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে অবলোকন করলো দু-জনে—এক টান-চামড়ার ঋজু ছিপছিপে যুবক, আর এক ম্লানচক্ষু পাংশুকপোল বৃদ্ধ, আর তাদের মধ্যিখানে, দোলনায় ঘুমন্ত শিশুর মতো, শুয়ে রইলো শান্ত টেবিলের উপর সেই কালো চোঙাটি, যেন দু-জনের মধ্যে কোনো সম্ভবপর সেতুবন্ধের ইঙ্গিত। বিনায়ক একবার তাকালেন সেদিকে, তাঁর দৃষ্টি যেন প্রতিহত হ'য়ে ঘরের

চারদিকে ঘুরে এসে আবার আটকে গেলো অমিতের মুখে। তার কপালে কয়েকটা স্বেদবিন্দু লক্ষ করলেন তিনি ; মনে হ'লো তাঁর জুতো আর মোজা ফুঁড়ে কাঠের মেঝে থেকে ঠাণ্ডা উঠে আসছে। তাঁর ঠোঁটের পাশে গর্তের মতো একটা ভাঁজ পড়লো।

'অত ব্যস্ত কেন, অমিত, এমনিও আমার আর বেশিদিন নেই।'

'কে জানে—কে জানে,' যেন কষ্টকরভাবে নিশ্বাস নিয়ে যুবকটি বললো, 'আরো দশ বছর হ'তে পারে। আরো কুড়ি বছর হ'তে পারে। আমি আপনাকে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি আপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বৃদ্ধের শিথিল কণ্ঠমণি একবার ন'ড়ে উঠলো ; তিনি ক্ষীণ স্বরে তাঁর শেষ আবেদন জানালেন : 'আমার আরো কয়েকটা বই লেখার ছিলো।'

'আ!' একটা চীৎকার, জয়ধ্বনি আর আর্তনাদের মাঝামাঝি একটা শব্দ, যুবকটির গলা ছিঁড়ে বেরোলো। 'আপনি এখনই অতীত-বচন ব্যবহার করছেন। আমার দাবি মেনে নিয়েছেন তাহ'লে। আপনি আমার সঙ্গে একমত। অলিখিত বা অসমাপ্ত কাব্য বিশ্বের বাতাসে অনেক ভেসে বেড়াচ্ছে, আপনি সেজন্য চিন্তিত হবেন না। আর তাছাড়া,' একটু থামলো অমিত, তার কপালে স্বেদরেখা আরো স্পষ্ট হ'লো—'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, শুধু মনস্থির করতেই অনেকদিন কেটে গেলো। ছ-মাস ধ'রে, দীর্ঘ ছ-মাস ধ'রে আমি এই নির্জনে ব'সে শুধু চিন্তা করেছি, পরিকল্পনা করেছি—উৎসুক, কম্পমান, কিন্তু পুরোনো দু-একটা দুর্বলতায় বাধাগ্রস্ত। এখন আর চিন্তা নয়, কাজ ; দ্বিধা নয়, বিস্ফোরণ। কিন্তু তার আগে আমাকে নিজের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আমি এই বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নেবার যোগ্য, জগৎকে বদলে দেবার যোগ্য, আর সেই প্রমাণের জন্য আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত উপাদান—আপনি। আমি এককালে আপনার

জীবনে অংশ নিয়েছিলাম ; আপনার আর আমার মধ্যে সামান্য স্মৃতি অনেক আছে, আপনি মর্মস্পর্শী লিখনসমেত আমাকে আপনার নতুন বই উপহার দিয়েছেন ; আমি বরফের ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে রাত তিনটের সময় আইডলওয়াইল্ড এয়ারপোর্টে গিয়েছি আপনার জন্য ; আপনার স্ত্রী আমাকে মায়ের মতো ভালোবেসেছেন। কেউ নেই—আপনার চেয়ে যোগ্য উপাদান কিছু নেই আমার। আপনি উইল করেছেন ? সুপ্রিয়া দেবীকে আপনার সব বইয়ের স্বত্ব লিখে দিয়েছেন তো ? আপনি আমার প্রথম পরীক্ষাস্থল—আমার পৌরুষের, আমার প্রতিজ্ঞার, আমার অপ্রতিরোধ্য শক্তির। আমার সংযম, আমার নিষ্ঠা, আমার আত্মবিজয় : আপনি তার প্রমাণ দেবেন আমাকে। আপনার বালিগঞ্জের বসার ঘরে অনেক আনন্দিত সন্ধ্যা আমি কাটিয়েছি—আমার চপল, বিলাসী, নিষ্ফল, রোমান্টিক যৌবনে। আমার সেই অতীত—যার মধ্যে পরতে-পরতে জড়িয়ে আছেন আপনি—তার স্মৃতির গতিরোধক সম্মোহন থেকে মুক্ত না-হ'লে আমার চলবে না। আর দু-মিনিটের মধ্যে, আপনারই সঙ্গে, নিহত হবে আমার রোমান্টিক যৌবন, আর—অন্তত সাংকেতিকভাবে, সেই তীব্র, মদির, হৃদয়নন্দন কবিতা, যা না-জেনে, না-বুঝে অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেয়, দিয়ে এসেছে যুগে-যুগে। আমি কোনো সাহায্যকারী ডেকে আপনাকে অসম্মান করবো না; আপনি স্থির হ'য়ে দাঁড়ান দু-হাতে টেবিলটা চেপে ধরুন। কবে আমার কাছে অনাগত এসে পৌঁছবে, আমি সেজন্য ব'সে থাকতে পারি না ; আমি ঝাঁপিয়ে পড়বো তার উপর, সৃষ্টি ক'রে নেবো একই মুহূর্তে, একই আঘাতে—আপনার আর আমার ভবিষ্যৎ। বিনায়ক দত্ত : আপনি আর আমি আজ সহযোগী, সহযন্ত্রী ; আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে, বিপুলভাবে আমরা হ'য়ে উঠছি পরস্পরের অংশিদার—হ'য়ে উঠছি ইতিহাস, ভাবীকাল, অজাত এক নতুন পৃথিবীর প্রথম সোপান ; আজ থেকে—উত্তরপুরুষের শিক্ষার জন্য, প্রেরণার জন্য, এক চূড়ান্ত,

ভয়াবহ, উল্লসিত উদাহরণস্বরূপ অচ্ছেদ্যভাবে দুটি নাম যুক্ত হ'য়ে গেলো ; বিনায়ক দত্ত, আর তাঁর ভক্ত সুহৃদ, তাঁর হত্যাকারী—অমিত বিশ্বাস।'

বৃদ্ধটির চোখের সামনে ভেসে উঠলো অমিতের ঘর্মাক্ত, রক্তিম, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, স্ফীত শিরা কপালে, ঠোঁটের কোণে ফেনা, আর তাব হাতের মুঠিতে ধরা কালো ইস্পাতের অগ্রভাগ। ফুশফুশে অনেকখানি বাতাস একসঙ্গে টেনে নিলেন তিনি, নিশ্বাস ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'হায় অমিত বিশ্বাস, অনুদ্ধারণীয় রোমান্টিক!'

পিস্তল ছোঁড়ার শব্দে বাক্যটি বিচূর্ণ হ'য়ে গেলো।

মৃত্যুর আগে জাগরণ

খৃষ্টাব্দ উনিশ-শো পঁয়ষট্টিতে, কলকাতার শুকলাল কার্নানি হাসপাতালের এক কামরায়, পঁচাত্তর বছর বয়সে, রোদে আর বৃষ্টিতে মেশা এক ভাদ্রের দিনে, শান্তভাবে ও ধীরে-ধীরে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস মুখোপাধ্যায়।

বাইরে, কামরার সামনে করিডরে, অথবা কোনো বারান্দায়, কিংবা হাসপাতালের বাগানে ঘুরে-ফিরে অপেক্ষা করছে তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ (সকলেই প্রৌঢ়, সকলেই ক্লান্ত), একটি দৌহিত্রী ও একটি পৌত্র (বয়স যথাক্রমে একত্রিশ ও চব্বিশ), আর কতিপয় বিবিধ আত্মীয়-বন্ধু, যারা অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছে। বেলা দশটায় এসেছে তারা, এখন প্রায় চারটে ; চরম বার্তাটি এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

কামরার ভিতরে দু-জন নার্স, দক্ষ ও শ্বেতবসনা, একটি যুবক ডাক্তার রোগীর শিয়রে উপবিষ্ট, মাঝে-মাঝে একজন বিশারদ এসে দেখে যাচ্ছেন, টেবিলে বিবিধ যন্ত্রপাতি ওষুধ ইঞ্জেকশন সাজানো। এঁরা আরোগ্যের আশা আর রাখেন না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন যাতে মৃত্যু যন্ত্রণাহীন হয়।

আর বৃদ্ধ দেবকীদাস—তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো, হাত দুটি কোমরের উপর ভাঁজ করা, ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, টান হ'য়ে শুয়ে নিশ্বাস নিচ্ছেন নিয়মিত ছন্দে, যেন গভীরভাবে ঘুমন্ত। মৃত্যু বলতে যে-সব ভয়াবহ ছবি আমাদের মনে জাগে তার কোনো চিহ্ন তাঁর মুখে নেই ; হাসপাতালে মাসাধিকব্যাপী বিশ্রাম ও শুশ্রূষা তাঁর চেহারায় কোনো হানি ঘটতে দেয়নি, পাৎলা শাদা চুলের তলায় তাঁর ডিম্বাকৃতি কপালটি এখনো সুচারু ; আর টিকোলো নাক ও পাৎলা ঠোঁট নিয়ে তাঁর গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ্য মুখাবয়ব দেখে এখনো ঠিক ধারণা করা যায় না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু সেই মুখশ্রীকে কালিমালিপ্ত ক'রে দেবে।

সুখে মারা যাচ্ছেন দেবকীদাস, গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, কিন্তু স্বপ্নহীন-

ভাবে নয়। বরং বলা যায়, ডাক্তারি মতে তাঁর ঘণ্টা বেজে যাবার পরেও তিনি যে এতক্ষণ ধ'রে জীবিত আছেন, তার কারণই স্বপ্নের আকর্ষণ। স্বপ্নে একটি জন্তুকে দেখছেন তিনি, কোনো রোমশ নৈশ জন্তু, অস্পষ্ট, অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে সঞ্চরমাণ, নিঃশব্দে, তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে, স্পর্শময়। কিন্তু 'দেখছেন' কথাটা সংগত নয় এখানে; কেননা সুস্থ মানুষের স্বপ্নে যেমন সব কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্যে অনূদিত হ'য়ে যায়, এই মুমূর্ষুরও তা-ই হচ্ছে; তাঁর নিজের আর কৃত্য কিছু নেই, এখন এক অজ্ঞাত শক্তির তিনি অধীন—এক চিন্তাহীন, চেষ্টাহীন, অধিকৃত অবস্থায় এই শেষ মুহূর্তগুলি মসৃণভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর উপর দিয়ে। বলা বাহুল্য, এটা তাঁর মরণশীলতার শেষ দশা, এর আগে অন্য কয়েকটা পর্যায় তাঁকে পেরোতে হয়েছিলো।

২

অধিকাংশ মানুষের মতো, দেবকীদাসেরও অনেকটা সময় লেগেছিলো তাঁর মৃত্যুর সন্নিকটতা বুঝে নিতে ও মেনে নিতে। একদিন হঠাৎ বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উঠলো, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হ'লো হাসপাতালে, জ্ঞান ফিরে পেয়ে তাঁর প্রথম চিন্তা: 'আমি বাড়ি যাবো, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।' তিন বছর আগে পিশাচ-সংহিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, নানা অবান্তর কারণে অর্ধেকের বেশি এগোয়নি। আর তাঁর বহুকালের পরিকল্পিত রোমানি ভাষার শব্দতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ—এতদিনে সেটাতে সবেমাত্র হাত দিতে পেরেছেন। কী সেই নিগূঢ় ঐতিহাসিক যোগ, যার জন্য তথাকথিত জিপসিদের মুখে—হোক হাঙ্গেরিতে বা স্পেনে বা আয়র্লণ্ডে—এখনো বহু শব্দ শোনা যায় যা অবিকলভাবে আধুনিক বাংলা: এই বিষয়টি তাঁর আলোচ্য। প্রশ্নটি কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এ-মুহূর্তে পৃথিবীতে

কেউ তা নিয়ে ভাবছে না—হাইডেলবার্গে ডক্টর ৎসিমারমান্‌ ও কলকাতায় তিনি ছাড়া। আর পিশাচ-সংহিতা—সেই মনোমুগ্ধকর বিরল পুঁথি (খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতকের), যাকে বলা যায় মনুসংহিতার একটি তান্ত্রিক ব্যঙ্গানুকৃতি, বর্ণিলভাবে আদিরসাত্মক, যার ব্যাকরণে পাণিনির মুণ্ড চর্বিত ও বক্তব্যে সনাতন ধর্ম ছিদ্রিত হয়েছে, সেটির প্রথম ইংরেজি অনুবাদ (লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি ফোটোস্টাট কপি পাবার পরে) প্রকাশ করার উচ্চাশা তিনি পোষণ করছেন। এই সব প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করবে তুচ্ছ কোনো শারীরিক বৈকল্য, তা দেবকীদাস কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। হাসপাতালে প্রথম কয়েকটা দিন এই কারণে বড়ো অশান্ত ছিলো তাঁর মন।

পুত্রকন্যা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেনি, সব প্রাপণীয় চিকিৎসা ও সেবাযত্ন তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁকে সংবাদপত্র ছাড়া আর-কোনো পাঠ্যবস্তু দেয়া হচ্ছিলো না, তাই দিনমানব্যাপী অবকাশ ও দৈহিক বিশ্রাম তাঁর মনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আনুষঙ্গিক অন্য দু-একটি দুশ্চিন্তায়, এমনকি অনেক আগেকার ও অনেক আগে ভুলে-যাওয়া এক আক্ষেপে। থেকে-থেকে তাঁর মনে পড়ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর চাকুরি-জীবন। তাঁকে ডেকে এনেছিলেন স্বয়ং স্যর শিবশঙ্কর (তখন দেবকীদাস সামান্য স্কুলমাষ্টার, মহানির্বাণতন্ত্র বিষয়ে একটি পুস্তিকামাত্র প্রকাশ করেছেন), কিন্তু সেই বিদ্যোৎসাহী উদারচেতা পুরুষের অকস্মাৎ মৃত্যু হ'লো, আর তারপর পনেরো বৎসরেও দেবকীদাসের পদোন্নতি হ'লো না। তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠলো যে তিনি বিশেষজ্ঞ নন, পল্লবগ্রাহী, তাঁর কৌতূহল বড়ো বেশি ব্যাপক; যিনি 'শূন্যবাদের ভূমিকা' লেখার দু-বছর পরে প্রকাশ করেন কবিয়াল-গানের সংকলন (তাও সব অশ্লীলতা অবর্জিত রেখে), তারপর স্কীট সাহেবের ব্যুৎপত্তিনির্দেশে একুশটি ভুল দেখিয়ে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে

সমালোচনা প্রকাশ করেন (আর, একই সময়ে, কিছুটা অশোভনভাবে, বীরবলি বাংলা সমর্থন ক'রে বীরবলি ভাষাতেই 'সবুজপত্রে' একটি প্রবন্ধ) এবং যার স্বরচিত 'এ কম্পারেটিভ স্টাডি অব বেঙ্গলি, ওড়িয়া অ্যাণ্ড অ্যাসামীজ় ফোনেটিক্স'-এ অনেক সিদ্ধান্ত অনুমানমাত্র—তাঁকে কী ক'রে আধুনিক অর্থে 'স্কলার' বলা যায় ? তিনি যে উৎসাহপ্রবণ, কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে সর্বদা চেষ্টাশীল, এটাই তাঁর অসারতার প্রমাণ ব'লে কথিত হ'লো ; কালক্রমে চাকুরিক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম ক'রে গেলেন এমন কেউ-কেউ, যাঁরা ছাত্রজীবনের অবসানের পরে আর ধবল কাগজের ধ্যানভঙ্গ করেননি, কিন্তু নিয়মিতভাবে কর্তৃপক্ষকে ভজনা ক'রে গেছেন। অনেকবার সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে অসম্মানিত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন দেবকীদাস। তুচ্ছ ঘটনা—শত্রুরা অজ্ঞাতসারে তাঁকে উপকৃত করেছিলেন, তাঁকে দিয়েছিলেন স্বকর্মের জন্য অখণ্ড স্বাধীনতা ও সুযোগ—কিন্তু এই দীর্ঘকাল পরে তা যেন একটি তিক্ত স্বাদ ছড়িয়ে দিলো তাঁর মনের মধ্যে।

সঙ্গে-সঙ্গে, হাসপাতালের নির্গ্রন্থ কামরায় শুয়ে-শুয়ে, তাঁর মনে পড়লো তাঁর লাইব্রেরি-ঘরটি—বহু বৎসর ধ'রে বহু চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে অর্জিত তাঁর পুস্তকভাণ্ডার। নানা ধরনের নানা বিষয়ের বই—চটি পুস্তিকা থেকে স্থূলকায় বিশ্বকোষ পর্যন্ত ; কাশীতে ও কাটমাণ্ডুতে সংগৃহীত কয়েকটি মূল্যবান তালপাতার পুঁথি ; কিছু বটতলা ; দেশে-বিদেশে ভাগ্যে-খুঁজে-পাওয়া কিছু বিরল গ্রন্থ। স্বনিদ্রার পরে এক-একটি রাত্রি ভোর হয়। আর বইগুলির বিচ্ছেদবেদনা তাঁর মনে আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে। ওদের নিয়ে, ওদেরই মধ্যে জীবন কেটেছে তাঁর, এবং তা-ই কাটবে ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন, তাহ'লে কেমন ক'রে এটা হ'তে পারছে যে সারাদিনে একবারও তাঁর দেখা হচ্ছে না ওদের সঙ্গে ? আর তাছাড়া ... অন্য এক প্রশ্ন ... কী হবে বইগুলোর, তিনি যখন গত

হবেন? এ-যাত্রায় না-হয় সেরে উঠছেন, কিন্তু ঘটনাটি তো অনিবার্য। কতবার ভেবেছেন কোনো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে দানপত্র লিখে রাখবেন, কিন্তু আসক্তি তাঁকে বাধা দিয়েছে। এদিকে তাঁর পুত্র আয়কর-বিভাগের অধিকর্তা, জামাতা চক্ষুচিকিৎসক, নাতিরা শিক্ষা পেয়েছে ডাক্তারিতে বা যন্ত্রবিদ্যায়, ঐ সব পেশা থেকেই নাৎনিদের জন্য পাত্র পাওয়া গেছে বা খোঁজা হচ্ছে: তাঁর কোনো নিকট আত্মীয়ের পক্ষে ও-সব বই কখনো ব্যবহার্য হবে, এমন সম্ভাবনা আণুবীক্ষণিক। ওরা বিব্রত হবে, আস্ত একটা ঘর-ভর্তি নিষ্প্রয়োজনীয় বইগুলো নিয়ে বিব্রত হবে; এমন দিন আসবে যখন খুবই যুক্তিসংগতভাবে সেগুলোর কোনো 'ব্যবস্থা' করতে চাইবে ওরা; আর তখন, তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে, কোনো অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীর সৌজন্যে, তাঁর পুরো লাইব্রেরি নিলেমে চড়বে একদিন—যারা বহুকাল ছিলো সহবাসী, তাঁরই পরিকল্পিত সামঞ্জস্যে সংবদ্ধ, তারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোথায় ছড়িয়ে পড়বে কে জানে। কিংবা হয়তো তাঁর স্মৃতির প্রতি পৌত্তলিক সম্মানবশত তারা স্তূপ ক'রে বাড়ির মধ্যেই জমিয়ে রাখবে কোথাও—বছরের পর বছর আর ফিরে তাকাবে না, এদিকে বৃষ্টি তার কাজ ক'রে যাচ্ছে, কীটেরা তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছে, হঠাৎ একদিন বইয়ের বদলে একরাশি কাগজের গুঁড়ো দেখতে পেয়ে ব্যথিত ও নিশ্চিন্ত হবে তারা। মনোকষ্টের এও একটি কারণ ছিলো বৃদ্ধের পক্ষে—এই সব দুশ্চিন্তা—হাসপাতালে প্রথম দশ-বারো দিন।

কিন্তু এর পরে তাঁর হৃদযন্ত্র আবার একদিন দুরাচারী হ'লো, আর সেই আঘাত থেকে সামলে ওঠার পর তিনি মুমূর্ষুতার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করলেন।

৩

'আমি মারা যাচ্ছি' : এই বার্তা এবারে তাঁর মস্তকে পৌঁছলো, কিন্তু তা থেকে তাঁর মনে কোনো ত্রাস বা যন্ত্রণার সঞ্চার হ'লো না। হয়তো তার কারণ এই যে পূর্বোক্ত 'আমি'টির সঙ্গে তিনি ঠিক মেলাতে পারছিলেন না নিজেকে, তাঁর অতি পরিচিত দেবকীদাস মুখোপাধ্যায়কে। ঐ 'আমি'র মৃত্যু একটা নির্বস্তুক তথ্য, যা সংবাদপত্রে দেবকীদাসেরও চোখে পড়বে—এমনি মনে হচ্ছিলো তাঁর। কিন্তু একই সঙ্গে, তাঁর চৈতন্যে সেই দেবকীদাসের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিলো; এতদিন যিনি ছিলেন পণ্ডিত ও গ্রন্থকার, কিয়ৎপরিমাণে যশস্বী বললেও অত্যুক্তি হয় না, তিনি অকস্মাৎ হ'য়ে উঠলেন এক বাসনাবিদ্ধ রক্তমাংসের মানুষ। শরীর থেকে মরা চামড়ার মতো তাঁর মন থেকে খ'সে পড়লো তাঁর কর্মজীবন, তৎসংক্রান্ত সব খেদ ও দুশ্চিন্তা। সমুদ্রের মধ্যে লোষ্ট্রের মতো ডুবে গেলো সেই বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তিনি এক ধূসর অতীতে কর্ম করতেন। পিশাচ-সংহিতার অনুবাদ, রোমানি ভাষা বিষয়ে তাঁর সন্দর্ভ—এগুলো সমাপ্ত হ'লো না ব'লে এখন আর তিনি পরিতপ্ত নন, শঙ্কাকুল নন তাঁর গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদল বানরকে টাইপ-রাইটারের সামনে বসিয়ে দিলে তারা দশ লক্ষ বছরের মধ্যে শেক্সপীয়রের সব নাটক লিখে উঠবে, এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে—আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই রচনা করবে রোমানি ভাষা বিষয়ে সেই প্রামাণিক গ্রন্থ, তিনি যা আরম্ভ করেছিলেন, কারো-না-কারো উদ্যোগে পিশাচ-সংহিতার অনুবাদও প্রকাশিত হবে। তাহ'লে : কী এসে যায়? আর তাঁর সংগৃহীত বইগুলি বিষয়ে তাঁর মনে একটি নতুন চিন্তার উদয় হ'লো : তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঐ বইগুলিরও মৃত্যু হবে, কেননা তিনি তাদের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ স্থাপন

করেছিলেন, তা ছিলো তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, বহু বৎসর ধ'রে তা বিবর্তিত হয়েছিলো, সেই সম্বন্ধটি একবার অবসিত হ'লে, আকারে-প্রকারে অস্তিত্ব থাকলেও তাঁ র ব্যবহৃত একটি বইও আর থাকবে না, তাঁ র পঠিত কোনো-একটি বই অন্য কেউ পড়বে না কোনোদিন। অতএব ছাপা কাগজ ও বাঁধাই সংবলিত যে-বস্তুগুলিকে তিনি অতি যত্নে রক্ষা করেছিলেন (যা আসলে কোনো পরিবর্তনশীল অন্তঃসারের আধারমাত্র), তা হস্তান্তরিত বা উপেক্ষিত বা বিনষ্ট হ'লে কী এসে যায়? এই স্বার্থপর চিন্তা তাঁকে সান্ত্বনা দিলো, কিন্তু তা অনুধাবন করতে গিয়ে তিনি ক্লান্তিবোধ করলেন, তাঁর দুর্বল-হ'য়ে-আসা মননশক্তি এক কোমলতর আশ্রয় খুঁজলো। দু-একটি নারীমূর্তি উদিত হ'লো তাঁর স্মরণে।

৪

দেবকীদাসের বয়স যখন তেইশ, পিতামাতার নির্দেশে ও আয়োজনে একটি ষোড়শবর্ষীয়া সদ্‌ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর যুবক-চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য জেগেছিলো অন্য একজনের জন্য—ভাটপাড়ায় তাঁদেরই প্রতিবেশিনী এক কিশোরী বিধবা, মেয়েটিও কম্পিত হয়েছিলো যেমন অল্প হাওয়াতেই গাছের পাতা ন'ড়ে ওঠে—কিন্তু সেই ছোট্ট বাতাস থেকে ঝড় তোলার মতো ক্ষমতা ছিলো না দেবকীদাসের; পিতার মতে বিধবাবিবাহ গর্হিত জেনে, তাঁর গোপন বাসনা তিনি চেপে দিয়েছিলেন। আর বিয়ের পরে, একটি সুস্নিগ্ধা তন্বীকে সঙ্গিনী পেয়ে, অন্যজনকে ভুলতেও তাঁর দেরি হয়নি। শান্ত চোখের মানুষ ছিলো সর্বাণী, মৃদুভাষিণী, অনুগত স্ত্রী, গুরুজনের সেবায় অক্লান্ত, সন্তানপালনে নিষ্ঠাবতী—পুরোনো হিন্দু ঐতিহ্যের সব শ্রী ও সুষমা দিয়ে তৈরি একটি মেয়ে। দেবকীদাসও তাকে দিয়েছিলেন স্নেহ যত্ন প্রীতি—যৌথ পরিবারের অসংখ্য দাবি মিটিয়ে যতটা সম্ভব ততটাই। স্ত্রীকে নিয়ে

তৃপ্ত, একটি পুত্র ও একটি কন্যার মুখ দেখে হৃষ্ট—নির্বিরোধ, নির্মল ছিলো তাঁর দাম্পত্যজীবন। কিন্তু বিবাহের মাত্র পাঁচ বছর পরে মৃত্যু হ'লো সর্বাণীর—তখনকার দিনের অচিকিৎস্য টাইফয়েড রোগে—ধীর, নম্র, প্রতিবাদহীন মৃত্যু। 'আর কিছুদিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে তার সঙ্গে—' হঠাৎ এই কথাটা ঝিলিক দিলো দেবকীদাসের মনে। 'না—না—ও-সব বাজে, দেহ ভস্ম হ'য়ে যায়, আর পরজন্ম যদি বা থাকে সেখানে আমরা কেউ কাউকে চিনবো না।'

স্ত্রীর মৃত্যুর সময়ে তিনি ছিলেন পূর্ণযুবক, কিন্তু স্বাভাবিক শোক স্বাভাবিকভাবে প্রশমিত হবার পরেও পুনর্বিবাহের প্রস্তাব তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর কারণ আর-কিছুই নয়, এক ধরনের আলস্য—কোনো বিশেষ কর্মে নিবিষ্ট হ'লে অন্য সব বিষয়ে আমাদের যে-ঔদাসীন্য আসে, তা-ই। আসলে এই সময় থেকেই তিনি গবেষণা-কর্মে মন দিলেন—প্রথমে স্ত্রীর শোক ভোলার জন্য, তারপর ক্রমশ সেটাই তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো, ঐ সূক্ষ্ম, সুদূর ক্রিয়াকলাপই হ'য়ে উঠলো তাঁর জীবনের আশ্রয়। ধূসর হ'লো সর্বাণীর স্মৃতি, সেই সঙ্গে নারী-সংক্রান্ত চিন্তা থেকেও নিষ্কৃতি পেলেন। এমনি কাটলো একে-একে চোদ্দ বছর, হয়তো তাঁর অবশিষ্ট আয়ুষ্কালও এমনি কাটতো, যদি না দৈবে দেখা হ'য়ে যেতো—

কার সঙ্গে? কোথায়? তীব্র শীত, বিস্বাদ খাদ্য, সূর্য অদৃশ্য বা ক্ষীণজ্যোতি, বিরলবাক লোহিতবর্ণ কর্মতৎপর জনতা। এসেছেন লণ্ডনের প্রাচ্য বিদ্যালয়ে এক বৎসরের জন্য আমন্ত্রিত অধ্যাপক হ'য়ে। কিন্তু সেই তুষারের শবাচ্ছাদ, সেই ধোঁয়া, মেঘ, কুয়াশার আস্তরণ—তারই তলায় প্রচ্ছন্ন ছিলো সে, তিনি জানতেন না। একদিন, অবশেষে সেই উত্তরদেশেও যখন শীত মন্দীভূত হ'লো (ওদের ভাষায় তারই নাম গ্রীষ্ম), তাঁর দেশে ফেরার প্রায় তিন মাস বাকি, বাঙালিদের এক প্রীতিসম্মেলনে দেখা হ'য়ে গেলো।

সে। চারুশীলা। তাঁর প্রথম যৌবনের প্রতিবেশিনী, উনিশ বা কুড়ি বছর আগে যার সঙ্গে তাঁর নিঃশব্দ ও বাঙ্ময় দৃষ্টিবিনিময় হ'তো—সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলো, পাথুরেঘাটার এক ধনীপুত্রকে গোপনে বিয়ে ক'রে লণ্ডনে ; সে-বিয়ে ভেঙে যাবার পর দেশে আর ফেরেনি, বা ফিরতে পারেনি—সেই থেকে বাসিন্দা হয়েছে ইংলণ্ডের, সব অর্থেই স্বাধীনা। নিঃসন্তান, আর বিয়ে করেনি (যদিও তার অর্থ এ-রকম নাও হ'তে পারে যে অন্য পুরুষ বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়নি কখনো), কর্ম করে এক প্রকাশকের আপিশে, যাঁরা ভারত-বিষয়ক পুঁথিপত্র ছেপে থাকেন। দেবকীদাস, বংশগতভাবে রক্ষণশীল—এই পূর্ব ইতিহাসে বিতৃষ্ণ হ'তে পারতেন তিনি, তাঁর মনে হ'তে পারতো চারুশীলার গতিপথ তার নয়নের দৃষ্টির মতোই বক্র, আর তাঁর নিজের পক্ষেও অনাচার হবে যদি কোনো নারীর সঙ্গে তিনি আকস্মিকভাবে যুক্ত হন ;—এ-সব দ্বিধা তাঁকে যে বিব্রত করেনি তাও নয়, কিন্তু তাঁর সব পারিবারিক সংস্কার ছাপিয়ে তাঁকে বিদ্ধ করলো এক আহ্বান, এক উষ্ণ, সজীব মোহময় উপস্থিতি—যৌবনের স্মৃতি দিয়ে রাঙানো, নূতনের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। ভাটপাড়ার সনাতনপন্থার বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ করেছিলো একটি দুর্বল তরুণী মেয়ে—তাঁর নিজের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি—সেই বিদ্রোহে মুগ্ধ না-হ'য়ে তিনি পারলেন না। অন্য দেশ, অন্য পরিবেশ, ভিন্ন লোকাচার, এক চঞ্চল, পরিবর্তনশীল জগৎ—আর তারই মধ্যে ঐ কান্তিময়ী সাহসিকা। সে যেন চোখের পলকে হরণ ক'রে নিলো তাঁকে, তার ফুরিয়ে-আসা শেষ তীব্রতার চাপে ভেঙে দিলো তাঁর ভীরুতা ও সংশয়—সব সাধিত হ'লো অতি সহজে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, যেন দু-জনেই ছিলো বহুকাল ধ'রে প্রস্তুত, বহুকাল ধ'রে অপেক্ষমাণ, যেন কোনো করুণাশীল দৈবের পরিকল্পনায় আজ দু-জনেই অভিভূত ও বাধ্য। নায়িকা তাঁকে হাতে ধ'রে নিয়ে গেলো জীবনের অন্য এক স্তরে ; দীক্ষা দিলো এমন সব রহস্যে এতদিন যা তাঁর পক্ষে শুধু জনশ্রুতি ছিলো। দেবকীদাস অর্জন

করলেন এমন কোনো-কোনো জ্ঞান, যা পুস্তকে বা পাণ্ডুলিপিতে বিবৃত নেই ; তিনি অশ্রুপাত করলেন নাট্যশালায় ; চিত্রশালায় কোনো নগ্নাকে দেখে প্রতিমার সামনে ভক্তের মতো দাঁড়ালেন, প্রীত হলেন পল্লী-অঞ্চলে কোনো তিনশো বছরের পুরোনো সরাইখানায় রাত্রি কাটিয়ে ; স্নিগ্ধ লঘু দ্রাক্ষামদিরার স্বাদ নিলেন, আবিষ্কার করলেন ঐ হিমাহত অমিত্র দ্বীপে এক মনোমুগ্ধকর শ্যামলিমা ;—এতদিনে ইংলণ্ড দেশটা তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লো। এক হৃদয়মন্থনকারী জাগরণ যেন, এক অযাচিত অবিশ্বাস্য উপহার। কিন্তু, যখন দেবকীদাসের মনে হচ্ছে তাঁর জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ হ'লো, তখনই একদিন জাহাজ-ঘাটায় জলের ব্যবধান বেড়ে চললো দু-জনের মধ্যে, তিনি বন্দরের ভিড়ে মোহিনীকে হারিয়ে ফেললেন।

হাসপাতালের কামরায়, বিছানায় বন্দী, দেবকীদাস ভুলে গেলেন তাঁর বর্তমান বয়স ; কিংবা, প্রাণশক্তি ক্ষীয়মাণ ব'লে, তাঁর কাছে ঝাপসা হ'য়ে গেলো যৌবন ও বার্ধক্যের ভেদ, অতীত ও বর্তমানেব মধ্যে বিচ্ছেদরেখা। কোথায় আছি আমি, কী করছি, কে চলছে আমার সঙ্গে ? আছি লণ্ডনে, খুঁজে পেয়েছি যাকে চেয়েছিলাম ··· এখনো চাই। এখনো ? কতকাল হ'য়ে গেলো ! কিন্তু এই প্রশ্নটি মুহূর্তের বেশি দাঁড়াতে পারলো না, 'কতকাল' বলতে কী বোঝায় তা যেন ঠিক ধারণা করতে পারলেন না তিনি ; এখন তাঁর মধ্যে যা চলছে তা যেন স্মৃতি নয়, ঘটনা, শুধু মনে-মনে ভাবা নয়, প্রত্যাবর্তন। চারুশীলা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, তার বয়স যে এতদিনে সত্তর হবার কথা, সে বেঁচে আছে কিনা সে-বিষয়েও যে নিশ্চয়তা নেই—এ-সব চিন্তা একবারও তাঁকে বিব্রত করলো না। সেই দিনগুলি, চারুশীলাকে নিয়ে কানায়-কানায় ভরা এক-একটি পাত্র, যা ডুবে গিয়েছিলো এক ঝাপটে সমুদ্রে—আজ তা-ই ঢেউ হ'য়ে, বাতাস হ'য়ে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো—প্রথম দেখা থেকে জাহাজ-ঘাটে বিদায় পর্যন্ত। বাঁচলেন

তিনি আরো একবার, স্পন্দিত হলেন, কষ্ট পেলেন। তাঁর রক্তে আবার জেগে উঠলেন স্মরদেবতা, তিনি পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধরলেন বিছানার চাদর, দাঁত বসিয়ে দিলেন বালিশে (যেমন করেছিলেন তিরিশ বছর আগে এক ভারতগামী জাহাজের কামরায়), নিঃশব্দ চীৎকারে উচ্চারণ করলেন একটি নাম; তারপর এক আকস্মিক স্বচ্ছ মুহূর্তে বর্তমানে ফিরে এসে ভাবলেন, 'সার্থকতা—এখানেই। মেধা, জ্ঞান, কীর্তি বা ক্ষমতায় নয়—এই হৃৎস্পন্দনে, অনুকম্পনে।' কিন্তু এই আবেগের চাপ তাঁর দুর্বল দেহ সহ্য করতে পারলো না; তাঁর বৃদ্ধ চোখ থেকে সব আলো হারিয়ে গেলো হঠাৎ; তিনি আবিষ্ট হলেন সেই মূর্ছায়, যা থেকে আর জাগরণ নেই। তাঁর মরণাপন্নতার উপান্ত্য দশা উপস্থিত হ'লো। সেই থেকে আজ তৃতীয় দিন।

৫

প্রথম দু-দিন কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন দেবকীদাস। সব স্থান ও তথ্য এখন নিশ্চিহ্ন, সব নাম লুপ্ত, তাঁর পঁচাত্তর বছরের চেনা পৃথিবী একটি-দুটি সংকেতের মধ্যে গুটিয়ে গেছে। কখনো একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন—ধাপে-ধাপে, এঁকে-বেঁকে, অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে; কখনো গলি প্যাঁচালো, দুই দিকে দেয়ালের চাপে গুমোট—হঠাৎ ভয়, সামনে-পিছনে কিসের যেন শব্দ। আবার কখনো উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে আলোয়, নাগরদোলায় ঘুরন্ত—জোরে, এত জোরে যে দম আটকে আসে—টুকরো দৃশ্য, ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়—কোনো মুখ, কোনো রাস্তা, কোনো জানলা, কোনো হোটেলের ঘর—সব অস্পষ্ট, অস্থির—এক পরিচালকহীন বিরক্তিকর ঘূর্ণি—আর এই সবের মধ্য দিয়ে, ফাঁকে-ফাঁকে, যেন কোনো গোপন রন্ধ্রপথ রচনা ক'রে নিয়ে, এক মূর্তি, বা পরিলেখ, বা আভাসমাত্র—যেন তাঁরই জন্য উদ্ভূত, তাঁকে ডাকছে, অপেক্ষা ক'রে আছে তাঁরই জন্য। এ-ই কি তাহ'লে মৃত্যু?

না বহুবিশ্রুত ভগবান ? না কি ··· আমরা যার নাম দিয়েছি ভালোবাসা তা-ই ? কিন্তু ভগবান কি আছেন ? ভালোবাসা কি সম্ভব ? ··· কিন্তু কিছু কি নেই যার কাছে ফেরার জন্য অনবরত চেষ্টা করি আমরা— জীবন ভ'রে, সব কাজে, সব খেলায়, সব ভাঙনে, সব রচনায় ? কী সেই চরম ? মৃত্যু ··· ভালোবাসা ··· ভগবান ··· নেই—কিন্তু কে বলে নেই ?—ঐ তো ! অবশিষ্ট ক্ষীণতম চৈতন্য দিয়ে দেবকীদাস যেন মূঢ়ের মতো আঁকড়ে ধরলেন এই তিনটি শব্দকে—মৃত্যু, ভালোবাসা, ভগবান—মর্ত্যলোকের সঙ্গে শেষ যোগসূত্র তাঁর ; আর তাও যখন ছিন্ন হ'লো, তখনই তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর মরণশীলতার ক্ষণস্থায়ী অন্তিম পর্যায়ে।

আজ সকাল থেকে সব অবান্তর দৃশ্য লুপ্ত হয়েছে ; এখন তাঁর অন্ধকার সুনির্দিষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন, তাই আরামদায়ক। কোনো রোমশ জন্তু, নৈশ, অস্পষ্ট, অন্ধকারের সুড়ঙ্গ-পথে নড়ছে, নিঃশব্দে, তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে, স্পর্শময়। শ্যাওলার স্পর্শ, কদম্বের, ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা চোরকাঁটার ; আর গন্ধ—এক উষ্ণ, সজীব, উন্মাদক ঘ্রাণ, অন্ধকারে আশা ছড়িয়ে, এক বিপুল, অচিন্ত্য নবজাগরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। সারাদিন ধ'রে খেলা চললো তাঁর সঙ্গে ঐ অস্পষ্ট সত্তার ; তারপর আহ্নিক আকাশে সূর্য যখন অস্ত যায়, দেবকীদাস সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলেন সেই স্পর্শ—প্রতি রোমকূপে তার শিহরন, দংশন, প্রভুত্ব— এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হ'য়ে। কিন্তু, সেই জন্তুর নাম ভালোবাসা, না ভগবান, না মৃত্যু, তা বোঝার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিলো না—এক অমেয় অনুভূতির মধ্যে নির্ভেদ ও নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিলো মানুষের সব ধারণা ও কল্পনা। সূর্যাস্তের আগেই ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ব'লে ঘোষণা করলেন।

প্রেমিকারা

একশো-দশ স্ট্রিটের মোড়ে সাবওয়ে থেকে উঠে এলাম। জুনের শেষ, গ্রীষ্মের শুরু, উচ্ছল ব্রডওয়ে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে দূরে, হাডসনের বাঁকে, আটলান্টিকের মোহানায়—সারা মানহাটান রঙিন, ছাইরঙা বাড়িগুলো গোলাপি। কতবার, কে জানে কতবার, সাবওয়ের সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, এই একশো-দশ স্ট্রিটের মোড়ে। এখন আর ভুল গাড়িতে উঠি না, টাইমস স্কোয়ারে শাট্‌ল ধরার জন্য সবুজ তীরের দিকে তাকাতে হয় না আর, সব মুখস্ত। আমি এই শহরের হ'য়ে গিয়েছি। আমার কাজের কোনো বাঁধা-ধরা সময় নেই, তবু ইচ্ছে ক'রে আপিশ-ছুটির সময়েই ফিরি, এই শহরের তীব্রতর স্বাদ নেবার জন্য। আপিশ-ফেরতা তুঙ্গ প্রহর আজ পেরিয়ে গেছে—গ্রীনিচ-গ্রামে পেপার-ব্যাক্‌-হাউস-এ ঢুকেছিলাম (হা ঈশ্বর, এদের এক-একটা বইয়ের দোকানে ঢুকলে মাথা-খারাপ হ'য়ে যায়!)—ন্যুয়র্কের অর্ধেক লোকের ডিনার হ'য়ে গেছে এতক্ষণে—তবু কী-ভিড়, এখনো কী-ভিড়! লক্ষ-লক্ষ মানুষ, নানা জাতের, নানা দেশের, নানা রঙের, মেয়ে, পুরুষ, বুড়ো, ছোকরা: তাদের মধ্যে আমিও। পিঁপড়ের জাঙালের মতো ছুটছে: আমিও। কেউ কারো দিকে তাকায় না, কিন্তু আমি তাকাই ওদের দিকে—গম্ভীর, রেখা-পড়া মুখগুলি, বাড়ি গিয়ে ডিনারের আশা, যার-যার গোপন দুশ্চিন্তা, স্ত্রীর অথবা স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার আশা—অথবা দুঃখ। প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, কিন্তু আমি এক সঙ্গময় সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে আছি। আজ বেরোবার সময় ভুল দরজা দিয়ে উঠে এসেছি উল্টো ফুটপাতে, হঠাৎ ধাঁধা লেগেছিলো, আমার হোটেলটাকে চিনতে পারিনি মুহূর্তের জন্য। সাবওয়ের এই এক অবদান—একই শহর, একই চৌরাস্তা, বাড়ি, আকাশ—নতুন-নতুন রূপে দেখা দেয়, পোশাকের ছাঁট বা রং বদলে যেমন প্রেমিকা, তেমনি। আর দশদিন, দু-শো চল্লিশ ঘণ্টা। তারপর এই সিঁড়ি দিয়ে আর উঠবো না, দেখবো না উঠে আসতে-আসতে ক্রমশ-বড়ো-হ'তে-থাকা চৌকো আকাশটাকে, উপরে উঠে অবাক হ'য়ে

যাবো না আকাশের তলায় আরো বড়ো একটা জগৎ দেখে। সেই একই সব মুখ, কিন্তু বদলে গেছে এখন, এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যা হালকা হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে, এখন তাকাচ্ছে সবাই পরস্পরের দিকে, কেউ আর নিঃসঙ্গ নেই। এই ব্রডওয়ের সান্ধ্য ভিড় এমনি হেসে-হেসে ভেসে যাবে, আমি থাকবো না। তাকে ছেড়ে.যেতে হবে—তা কে ও। পৌনে-আটটা, আটটায় তার আসার কথা : চলো জলদি। একটা ফোন করা যাক, যেন দেরি না করে। এই ড্রাগস্টোরেই—না, এক মিনিট দূরে সেই পেইস্ট্রির দোকান : চলো, ছোটো।- মেয়েটাকে দেখতে চাই একবার, ছেলেটাকেও। স্বামী-স্ত্রী? না, বড্ড বেশি মিল চেহারায়; নিশ্চয়ই ভাই-বোন। দিনেমার, ছিপছিপে লম্বা দু-জনেই, নিখুঁত ব্লণ্ড, ঋগ্বেদের ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী। হায়, অমন রূপ নিয়ে দোকানদারি, স্বর্গের দেবীরা বোতাম টিপে-টিপে যোগ-বিয়োগ করেন। আমার আগে তিন খদ্দের, আমি একমনে মেয়েটাকে দেখছি, এতদিন থাকলাম একটা ডেইট কেন চাইলাম না, ডলির যেদিন রাত্তিরে কাজ পড়ে তার আপিশে—কিন্তু কে জানে ওরাও যদি স্বামী-স্ত্রী, আমি আবার আংটি-ফাংটি দেখে বুঝতে পারি না, তা একটু আল্টুবাল্টু আলাপ করলেই জেনে নেয়া যেতো। কিন্তু ঐ একটু চোখে-চোখে হাসি, যা ওরা বিশ্বজনকে বিলিয়ে দেয়, তার বেশি আর এগোনো হ'লো না আমার, দশদিন পরে চ'লে যাবো। আমি শো-কেসে রাখা একা ফ্রুট-কেক চাইলাম, যাতে মেয়েটিকে নিচু হ'তে হয় বের করার জন্য। (কী তন্বী, যেন তরুণ বেণু; কী নমনীয়, যেন বেতস; আমার শুভ্রা, আমার তন্বী—কার না কবিতা?) বাক্সে ভ'রে দিলো, আমি বললাম কাগজে মুড়ে বেঁধে দাও, যাতে ওর লম্বা টিকোলো আঙুলের খেলা আর-একটুক্ষণ দেখতে পাই। এখন এটাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে, যদিও মিষ্টি-ফিষ্টি আমি একদম খাই না, ডলিরও তেমন পছন্দ নয়। সভ্য জগতে কেন বলা যায় না, 'কিছু চাই না, তোমাকে একটু দেখতে এলাম, আর-একবার তোমার নীল চোখের দিকে

তাকাতে এলাম?' দরজার কাছে এসে মনে পড়লো—টেলিফোন। 'বেলা ঘুমোয়নি এখনো, মার্থা আসামাত্র আমি বেরিয়ে পড়বো।' 'মার্থা কখন আসবে?' 'সময় হ'য়ে গেছে—যে-কোনো মুহূর্তে, ঐ যে ডোর-বেল্, এলো বোধহয়। তাহ'লে এক্ষুনি দেখা হচ্ছে—পনেরো মিনিটের মধ্যে।'

আ—এক্ষুনি। পনেরো মিনিট! ছুট-ছুট বাড়ির দিকে। দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আমার লণ্ড্রির ধোপানি, হাওয়া খাচ্ছে, কী যেন একটা মশলা চিবোয় সব সময়, তার কথায় তাই খোশবায়। আমাকে দেখে হাসলো—একটু দাঁড়াবো?—না, পনেরোর মধ্যে দু-মিনিট বোধহয় চ'লে গেলো, সময় নেই, আর দশদিন মাত্র। কী ভালো এই শহর, কী সুন্দর আজকের সন্ধেবেলাটা, প্রথম সত্যিকার নিঃশীত দিন, সব কাচের দরজা খোলা, সারা মুলুক রাস্তায়, ফুলওয়ালি ফলওয়ালিরা ফুটপাতে। কী ভালো এই অপেক্ষার বারো—সাড়ে-এগারো—এগারো মিনিট। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার চারতলার জানলায়, বাইরে তাকিয়ে, বাস্-এর পর বাস্ এসে থামছে, ওরই একটা থেকে নামবে সে—আমার প্রিয় মুখ, চোখ, ঠোঁট, গাল, সব-কিছু নিয়ে অবিকল সে, প্রস্তুত। বিশাল দশদিন এখনো হাতে আছে আমার—অফুরান সময়—রাজত্ব। আশা করি ট্যাক্সিতে আসবে না, বাস্-এ এলে তাকে নামতে দেখবো, দেখবো তার দুলে-দুলে হাঁটা, এই রঙিন আলোয়, তাকে তাকাতে দেখবো রাস্তার ওপার থেকে আমার জানলার দিকে। দুরদুর, বুকের মধ্যে দুরদুর, আমি অপেক্ষার চাপে কাঁপছি, আমার বয়স আর বিয়াল্লিশ নয়, আঠারো। চলেছি ঘোড়ার গাড়িতে, পাশে মঞ্জু। কী ভাগ্যে আমি আজ ভার পেয়েছি ওকে হস্টেলে পৌঁছিয়ে দেবার। কী আনন্দ, মঞ্জুকে দশটার মধ্যে ফিরলেই চলবে, এখন মাত্র সাড়ে-আটটা। ওর হস্টেলের ঠিক উল্টো পথে আমি যেতে বলেছি গাড়োয়ানকে—রমনার দিকে—ঘণ্টা হিশেবে ভাড়া দেবো বলেছি, যাতে

আস্তে চালায়। ফাল্গুনের সকাল, সবুজ রমনা, গলফ-কোর্স রেস-কোর্স, ঢালু ছাদওলা বাড়িগুলো যে যার বিশাল বাগানের মধ্যে লুকোনো, জনপ্রাণী নেই। মঞ্জু আমার পাশে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, অমন গা ঘেঁষে আগে কখনো বসিনি আমরা.। তুলকি তালে গাড়ি চলছে, ঘোড়ার খুরের শব্দে যেন আলস্য, মাঝে-মাঝে পাতার ঝিরঝির, কেমন ঝিম-ধরা নেশায় ভরা এই সকালবেলাটা। কথা নেই বেশি, শুধু মাঝে-মাঝে চোখে-চোখে তাকানো ; আমরা একা, তাই আজে-বাজে কথার আব্রু এখন ছিঁড়ে ফেলা যায় ; প্রতি মুহূর্তে আমার চোখে আরো সুন্দর হ'য়ে উঠছে সে, আমার ভালোবাসা তাকে সুন্দর ক'রে তুলছে। চোখ থেকে ঠোঁটে ছড়ালো হাসি, ঠোঁট খুলে গেলো, ঝিলিক দিলো দাঁত, জিভ, স'রে এসে দেখলাম আমি কী-রকম লাল ক'রে দিয়েছি তার ঠোঁট দুটোকে। সে-ই আমার প্রথম। মানে, প্রথম চুমো খাওয়া। ঈষৎ হাঁপাচ্ছিলো মঞ্জু, আমার হঠাৎ মনে হ'লো : অত কাছে থেকে মুখ দেখা যায় না— কোনটা ভালো, চুমো, না তাকিয়ে থাকা? কিন্তু মঞ্জুই মুখ এগিয়ে দিলো এবার, আমাদের সাহস বেড়ে গেলো, হঠাৎ দেখি রাস্তায় একটি বছর চোদ্দর দেহাতি ছেলে গোল-গোল চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, হাসছে। আমরা জানলার কপাট পর্যন্ত তুলে দিইনি, আমরা নিষ্পাপ, আমরা শিশু; এই পৃথিবী স্বর্গ। শিশু আমরা দুজনে, আমার বড়োজোর সাত, আর টুনটির বোধহয় পাঁচও পোরেনি, ফরিদপুরে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছি। আমার সব খেলা টুনটির সঙ্গে, আমি পুতুলকে কাপড় পরাই, মাটিতে গর্ত ক'রে উনুন জ্বালি, ঘাস-পাতা ছিঁড়ে কুটনো কুটে দিই তার রান্নার জন্য, আমি চেষ্টা করছি টুনটির মতো হ'তে, সে যা ভালোবাসে তা-ই ভালোবাসতে, তার জন্য প্রায় মেয়ে হ'য়ে যাচ্ছি আমি, আমার সমবয়সী ছেলেগুলোকে টুনটির তুলনায় বাঁদরের মতো লাগছে। কিন্তু সন্ধেবেলা আমার পুরুষ-সত্তা জেগে ওঠে, আমি তাকে পড়াবার ভার নিয়েছি, দ্বিতীয় ভাগ খুলে যুক্তাক্ষর শেখাই,

আমাদের মধ্যিখানে একটা হারিকেন লণ্ঠন, দুটো বড়ো-বড়ো ছায়া পড়ে দেয়ালে, আমি পড়ানো ভুলে ছায়া দুটোকে দেখি, দুটোই ছোটো কিন্তু একটা একটু বড়ো, কিন্তু লণ্ঠনটা অত কাছে ব'লে দুটোই খুব বড়ো, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ওরা মাথা নাড়ে, হাত নাড়ে, আঙুল বাঁকায়, আমার মজা লাগে দেখতে, আমি ওর পিছনে কুঁকড়ে ব'সে দুই ছায়াকে এক ক'রে দিই দেয়ালে, স'রে-স'রে গিয়ে আমার ছায়াকে ছুঁড়ে দিই ওর ছায়ার উপর, লণ্ঠনটাকে ঝাঁকানি দিয়ে-দিয়ে নানা রকম অদ্ভুত আকৃতি তৈরি করি—টুনটি খলখল ক'রে আহ্লাদি ধরনে হেসে ওঠে, আবার একটু-একটু ভয়ও পায়। এই এক রহস্য, ছায়া, এক আদিম সান্ধ্য রোমাঞ্চ, হাল আমলের ব্যাপ্ত বিদ্যুৎ যা ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কোহিনুর হোটেলে বিদ্যুৎ নেই, সারাদিন জ্বলজ্বলে রোদ্দুর আর রাত্রে পৃথিবী হারিয়ে যায় শুধু আমরা থাকি—আমি আর ইলা—এই ছোট্ট ঘরে তেতলায়, দরজার বাইরে প্রকাণ্ড ছাদ, ছাদের উপরে আরো বড়ো আকাশ, আর সামনে—আকাশের সমান বড়ো—বিশাল, প্রবল, চঞ্চল—ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ, সারা রাত চলে ঝড়ের মতো শব্দ, কিন্তু দিন ভ'রে নীল, শাদা, ফেনিল, সবুজ, বেগনি—সমুদ্র। সারা আকাশ এই ঘরের মধ্যে, দিগন্ত এই ঘরের মধ্যে, আর সমুদ্রের স্বর, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস—সব আমাদের, আমাদের জন্য। ইলা এই প্রথম এলো পুরীতে, রাত্রে তার ঢেউয়ের শব্দে ভয় করে, আমরা প্রায় সারা রাত না-ঘুমিয়ে কাটাই। ইলা যে এখন আমারই, আমার স্ত্রী, এই ধারণাটায় আমি অভ্যস্ত হ'তে পারছি না এখনো, প্রতি বার মনে হয় কোনো অন্যায় করছি, যা উচিত নয় তা-ই করছি, আর তাই যেন রোমাঞ্চের অন্ত নেই। এ কি সত্যি? সত্যি আমরা, ইলা আর আমি, তেতলার একলা ঘরে, সামনে সমুদ্র, মাথার উপর তারা-ভরা রাত্রি, অন্ধকারের বুকের মধ্যে আমরা লুকোনো? কোনটা সত্যি? এই দিন, রাত্রি, ঢেউয়ের তোলপাড়, রক্তের

তোলপাড়—না কি বিয়ে, সংসার, ভবানীপুরের খুপরি ফ্ল্যাট, সন্ধেবেলা দম-আটকানো কয়লার ধোঁয়া? চলেছি আমরা চৌরঙ্গির ট্রামে নিউ মার্কেটে, ইলার পাশে মেয়েদের আসনে বসেছিলাম আমি, কিন্তু এলগিন রোডে শাদা-কাপড়-পরা কয়েকটি নার্স উঠলো, আমি দরজার কাছে লম্বা আসনটায় স'রে এলাম। পরের স্টপে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে উঠে তক্ষুনি ব'সে পড়লো আমার পাশে, তার ও-পাশে এক পাদ্রি সাহেব বসলেন, অবশিষ্ট কয়েক ইঞ্চিতে একটি ছোটোখাটো ক্লান্ত কেরানি জায়গা ক'রে নিলো কোনোমতে। তিনজনের আসনে চারজন, পাদ্রিসাহেবটি মোটাসোটা, বেশ আঁটাআঁটি হচ্ছে, আমি চেষ্টা ক'রেও ফিরিঙ্গি মেয়েটির দেহের স্পর্শ এড়াতে পারছি না, নড়াচড়া করতে গেলে আরো বেশি অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটির ভঙ্গিতে বিব্রত হবার একটুও লক্ষণ নেই, আমি দেখছি তার মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়নি, চোখ দুটি বেশ প্রফুল্ল, যেন পাদ্রিসাহেবের গা বাঁচিয়ে তার শরীরের ভার আমারই উপর ছেড়ে দিয়েছে, আমি কথা বললেও সহজভাবে জবাব দেবে হয়তো। সুখ ছড়িয়ে পড়ছে আমার শরীরে—শীতের পড়ন্ত বেলার রোদ্দুর আমার পিঠে, আর এই এক অন্য উষ্ণতা—নিজেকে আমার অপরাধী লাগছে যেহেতু এই ট্রামেই ইলা (হ'লোই বা আমার দিকে পিঠ ফেরানো), আর যেহেতু অপরাধবোধ, তাই আমেজ আরো গাঢ়, যেন কোনো বাগানে দুলছি দোলনায়—খুব আস্তে (আসলে ট্রামের ডাইনে-বাঁয়ে দুলুনি), চোখ বুজে আসছে, বাতাসে পাচ্ছি ফুলের গন্ধ (আসলে মেয়েটির চুলের লোশন, মুখের পাউডার, বুকে-গোঁজা রুমালের সেন্ট)—এমনি কাটলো দশ—না, পাঁচ মিনিট হয়তো, তিনশো সেকেণ্ড, এক অনন্তকাল, আমি অনুভব করলাম আমার শরীর দিয়ে এক তরুণীকে, এক তরুণ সত্তা, এক অজানা জীবন—উষ্ণ, নরম, নতুন এবং অনাবিষ্কৃত। আমাদের সঙ্গে একই স্টপে নামলো মেয়েটি, ইলা আমার সঙ্গে আছে ব'লে আমাকে অন্য সব ইচ্ছে চেপে দিতে হ'লো (অন্তত ঠিকানাটা কি জেনে নেয়া যেতো

না ?), এমনকি রাস্তায় নেমে আর তাকাবারও চেষ্টা করলাম না—টের পেলাম না, কখন ঐ স্পর্শময়ী হারিয়ে গেলো চৌরঙ্গির ভিড়ে, চিরকালের মতো, শুধু পাঁচ মিনিটের কদমফুল আমাকে উপহার দিয়ে। এমনি হারিয়ে যায় সবাই, কাউকে ধ'রে রাখা যায় না, যার সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছো, যাকে বলছো স্বামী অথবা স্ত্রী, সেও অনেক আগে হারিয়ে গেছে। আমরা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছি, কেউ কাউকে চিনি না। পেল্লায় পার্টি, মদের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে এই প্রহিবিশনের শহরে, হাসিতে কথায় চাপা প'ড়ে গেছে আরব-সাগরের মৃদু্গুঞ্জন, নাগরদোলার মতো ঘুরছে চিত্র-তারকা, কোটিপতি, কূটনৈতিক, ইত্যাদিরা। আমি লেম্বু-পানি খাচ্ছি, আমি স্থির থাকতে চাই, আমি চোখে-চোখে রাখছি ঐ পাণ্ডুবরনী ফরাশিনী কাউণ্টেসকে, শরীরের খাপে-খাপে বসানো কালো মখমলের পোশাক তাঁর, যা দেখতে অতি সহজ সরল কিন্তু যার প্রতি তন্তুতে লুকিয়ে আছে শিল্পীর প্রতিভা, চাতুর্য, বৈদগ্ধ্য—অন্তত তা-ই ধ'রে নেয়া যায়—আমাকে জেনে নিতে হবে ডিয়রের তৈরি কিনা। আমি আসামাত্র দু-চার মিনিট পেয়েছিলুম এই ভারতপ্রেমিকা লেখিকাকে, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না-ক'রে জিগেস করেছিলাম তিনি কি বোদলেয়ারের ভক্ত ; উত্তরে, চোখে হেসে, মর্মরস্বরে, তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন সেই আশ্চর্য কবিতার প্রথম স্তবক, যার শিরোনামা 'ভ্রমণের আমন্ত্রণ'। তাঁর ঠোঁট থেকে ফরাশি শব্দগুলো বিন্দু-বিন্দু মধু-র মতো ঝ'রে পড়লো আমার কানের উপর, তাঁর ইংরেজি বলার বিদেশী টান মুগ্ধ করলো আমাকে, তাঁর চোখের কোলে বয়সের সূক্ষ্ম রেখাগুলিতে আমি এক নতুন সৌন্দর্য দেখতে পেলাম। কিন্তু তার পরেই বিবর্ধমান ভিড়ের চাপে আমাকে স'রে আসতে হ'লো, আমি ঐ মোহময়ীর সামনে আর এগোতে পারছি না, সব সময় দেখতেও পাচ্ছি না ঐ উজ্জ্বল কালো মখমলের পোশাকে ঢাকা তন্বীকে, যেন কৌটোর মধ্যে রত্ন, যেন খাপের মধ্যে তলোয়ার—কী-রোমশ কালো

ঐ মখমল, বোদলেয়ারের কবিতার মতো, কালো, যার গা ফেটে জ্যোতি বেরোচ্ছে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুধু লেমু-পানি গিলছি—বরং একটা সিন্‌ৎসানো নেয়া যাক এবার, না—ও-সব জোলো রোমান্টিকে কাজ নেই, ক্লাসিকল স্কচই ভালো। না—মদ্য নয়, খাদ্য চাই এখন, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে ভাটিকান দেখার পরিশ্রমে, এইমাত্র হোটেলে ফিরলাম, বেলা তিনটে। ডাইনিং-রুম বন্ধ, বেইজ্‌মেণ্টে স্ন্যাক-বার-এ এসেছি। অসময়, আমি ছাড়া খদ্দের নেই, শুধু লং-বেঞ্চে ব'সে একটি চওড়া কাঁধের জর্মান যুবক বিয়ার খাচ্ছে। আমি খেতে-খেতে মুখ তুলেছি একবার; রাস্তায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হ'য়ে, ছবির মতো। আবছা আলোর বেইজ্‌মেণ্টে আমি, একতলা উপরে ফুটপাতে মেয়েটি, বাইরে গ্রীষ্ম, ঝকঝকে কাচের জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—যেন রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালো নায়িকা। পাৎলা শাদা নিচু-গলার পোশাক তার পরনে, আমি বতিচেল্লির ছবি ভাবছি, কিন্তু হঠাৎ সেই বাসন্তিকা যেন হাত নাড়লো, হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলো যেন—একবার, দু-বার—তারপর নিচু হ'য়ে, কাচে প্রায় নাক ঠেকিয়ে হাত দিয়ে নির্ভুল বার্তা পাঠালো—এসো। কাকে? জর্মান লোকটি নিশ্চল, তার পিঠ একইভাবে ফেরানো, আর মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তাকে দেখতে পাবারও কথা নয়। আমাকে?—যাঃ! আমি আমার অমলেটে মন দিলাম আবার, কিন্তু—যে নিজে এগিয়ে এসে ধরা দিচ্ছে তাকে হুট ক'রে ফেরৎ পাঠানো কি বোকামি নয়? নয় কাপুরুষতা? জীবনের প্রতি অসৌজন্য? অন্তত দেখা যাক না ব্যাপারটা কী। কিন্তু চোখ তুলে দেখি—নেই। খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছি বাইরে—নেই। গেলো কোথায়? ভোজবাজি নাকি? সারা বিকেল ঐ মেয়েটাকেই ভাবছি, রাগ হচ্ছে নিজের উপর, আর রাত্রে যখন ভিয়া ভেনেতোয় ফ্যাশানদোরস্ত ভিড় জ'মে উঠেছে, আমি হাঁটছি কাফে থেকে কাফেতে, সারি-সারি মুখে চোখ

ফেলে-ফেলে—কিন্তু, দেখলেও কি আর চিনতে পারবো এখন? আমি কি সত্যি দেখেছিলুম, না কি আমার হঠাৎ উস্কে-ওঠা কামনা দিয়ে গ'ড়ে তুলেছিলুম এক বাঞ্ছনীয়াকে? আসলে হয়তো অতি সাধারণ রাস্তা-হাঁটুনি ছিলো মেয়েটা (সেই চৌরঙ্গির ট্রামে আমার পাঁচ মিনিটের প্রতিবেশিনীরই মতো)—আমাকে বিদেশী দেখে ভেবেছিলো সহজ শিকার—আর তারই জন্য আমি নষ্ট করলাম সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যা—আর কোথাও নয়, রোমে, যেখানে, আজই সকালে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, আমি জীবনে প্রথমবার দেখেছি সিস্টিন চ্যাপেল আর ভাটিকানের ঐশ্বর্য। ঐ পাৎলা শাদা পোশাক, গলার ডৌল, বুকের চেরা রেখা, যা নিশ্বাসের সঙ্গে ওঠে নামে, ঐ শস্তা ফেরি-করা রূপের ডালি—আমি কি তারই জন্য এতগুলো ঘণ্টা ধ'রে ভুলে ছিলাম এই শাশ্বতী নগরীকে, অমর মিকেলাঞ্জেলোকে? এই তো, আমার নতুন-কেনা বইগুলো সাজানো আছে শেলফে; টোমাস্ মান্-এর উপন্যাস, রিল্কের কবিতা, সফোক্লিস-এর একটা চমৎকার নতুন অনুবাদ—আর আমি ছটফট করছি ডলি আসছে না ব'লে, আমার দিনগুলি উড়ে চ'লে যাচ্ছে হয় ডলির সংসর্গে, নয়তো বা তার অপেক্ষায় ব'সে থেকে-থেকে;—যে-সব ঘণ্টাগুলিতে আর-একবার 'ফিলোকটিটিস' পড়া যেতো, শোনা যেতো দেবদূতের পাখা-ঝাপটানি, দেখা যেতো নরকের আগুন থেকে সরস্বতীকে ফাউস্টের কাছে উঠে আসতে, সেই সব সময়কে টইটুম্বর ভ'রে রেখেছে ডলি গর্ডন, যে কবিতা বোঝে না, মেট্রপলিটান ম্যুজিয়মে যেতে চায় শুধু ওদের ফোয়ারা-বাগানের ধারে ব'সে লাঞ্চ খাবার সুখের জন্য, যার সময় হ'লো না ব'লে (বা ইচ্ছে হ'লো না ব'লে) আমি মৎসার্টের 'দন হুয়ান' শুনতে পেলাম না, টিকিট পেয়েও ছেড়ে দিলাম। কী নিষ্ঠুর এই ব্যাপারটা—লোকেরা যার নাম দিয়েছে প্রেম। কী যন্ত্রণা—এই অপেক্ষা! আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেলো, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে চোখ

টাটাচ্ছে আমার, দশবার টেলিফোনের কাছে গিয়ে দশবার ফিরে এসেছি। আমার কী-দায়? তার আসার কথা, দেরি হ'লে সে-ই খবর দেবে: সেটা তারই কর্তব্য, দায়িত্ব। আমার খিদে পেয়ে গেছে, সেই কখন লাঞ্চে খেয়েছিলাম হ্যাম্বার্গার (একা-একা ভালো জিনিশ খেতে ভালো লাগে না)—তার এটুকু পর্যন্ত বোধ নেই যে তারই জন্য আমি না-খেয়ে ব'সে আছি। আমি বেরিয়ে যাই না কেন—এসে ফিরে যাক ডলি, শাস্তি পাক, বুঝে নিক সেও নয় মহারানী আর আমিও নই দাসানুদাস। ডলি ইচ্ছে ক'রে করে এটা, আমাকে কাঁটাগাছে ঝুলিয়ে রেখে তামাশা দ্যাখে দূর থেকে, নিজের ক্ষমতার আস্বাদ নেয়। এদিকে আর দশদিন মাত্র। সত্যি সে কি ভালোবাসে আমাকে? না কি একবার ধরা দিয়ে প্যাঁচে প'ড়ে গেছে, আমার সোনালিয়া এখন ছটফট করছে খাঁচায়? অথচ এই মানুষই, আমি যখন হোটেল ম্যাস্কট-এ সর্দির জন্য বেরোতে পারছি না, বাইরে শীত, রোজ এসেছে আমার জন্য খাবার নিয়ে—চিংড়ি, হ্যাম, মুর্গি, আপেল, রাইনওয়াইন, নিজের সেঁকা টাটকা নরম গরম রোল—একদিন লিফট খারাপ ছিলো, হেঁটে উঠে এসেছিলো আমার দশতলায়, হাতে খাবার ঝুড়ি, মাথায় রুমাল বাঁধা, তার হিস্পানি চোখে টলটলে আলো, ওভারকোটে বরফের গুঁড়ো, ঠাণ্ডায় আর সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে নিশ্বাস ঘন, ঈষৎ ঠোঁট খোলা, আমার জন্য স্বাস্থ্য আর আর আনন্দের ডালি সাজিয়ে, যেন প্রাণময়ী, যেন অন্নপূর্ণা। আমি অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে—ডলি, ডোরা, ডলরেস, আমার ধলেশ্বরী, আমার দোলনচাঁপা—কেমন ক'রে জিম গর্ডন তাকে ছেড়ে যেতে পেরেছিলো! ভালোবাসা: তবে কি তাকে এক মুহূর্তের হ'তেই হবে? বাসনা, বাসনার উন্মেষ—শুধু কি তারই নাম ভালোবাসা, বাসনার তৃপ্তি হ'লেই রঙিন ছবির উল্টো পিঠ বেরিয়ে পড়ে? আ— যদি ডলির বদলে হ'তো সেই ফরাশি কাউণ্টেস, যার ঠিকানা আমি রাখিনি, যার নাম পর্যন্ত আমি ভুলে গিয়েছি, অথচ যার সঙ্গে হয়তো

আমার হ'তে পারতো মনের মেলামেশা, এমন এক ধরনের ভালোবাসা যাতে থেকে-থেকে গোঁয়ারের মতো উৎপাত করে না শরীর! তার সাহায্যে আমিও হয়তো খুঁজে পেতাম রাসিনের চাবি, বরফের আগুন, দ্বিপদীর ঢাকনায় লুকোনো বিদ্যুৎ; বুঝে নিতাম, কী সেই গোপন জাদু, যার জন্য বিদগ্ধ ফরাশিমাত্রেই রাসিন বলতে অজ্ঞান, অথচ বিদেশীরা কিছুতেই যার নাগাল পায় না। কত বড়ো লাভ হ'তো আমার জীবনে, নতুন রাজত্ব জয় করার মতো। কিন্তু এমন কোনো-কোনো সময় আসে যখন আমরা আর জয় চাই না, আনন্দও চাই না—শুধু শান্তি চাই। আর শান্তি দিতে পারে—শুধু শরীর। বই বড্ড ভাবায়, বই খারাপ। শরীর কোনো তর্ক তোলে না, শরীর ভালো। কোনো সুন্দরী সামনে ব'সে থাকলেও মন শান্ত হয়, যেন একটা গোলাপি নেশা অজান্তে ছড়িয়ে পড়ে মনের উপর, আমাকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। আর তাই আমি ডলি গর্ডনকে চাই। দ্যাখো—পৌনে ন-টা, রাস্তায় আলো জ্ব'লে গেছে—সে করছে কী? আর পনেরো মিনিটের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে যাবে ফ্ল্যর-দ্য-লী—সাতাশি স্ট্রিটের সেই ছোট্ট ফরাশি রেস্তোরাঁ, ভিড় নেই, শামুক আর ঠাণ্ডা মিঠে সোটার্ন দেয় চমৎকার—যেখানে আজ ডলিকে নিয়ে ডিনার খাবো ব'লে সকাল থেকে পথ চেয়ে আছি। কেন আসছে না? এও কি সম্ভব যে তার মেয়ে এখনো ঘুমোয়নি, বা মেইড আসেনি এখনো? না কি ··· কোনো বিপদ হ'লো? রাস্তায় কোনো মাতাল ছোকরার শেভ্রলে তাকে চাপা দিয়ে গেলো? লিফটের রশি ছিঁড়ে পড়লো হঠাৎ? আমি যেন ডলিকে দেখতে পেলাম হাসপাতালে, চাদরে ঢাকা—সুন্দরী সে নেই আর, নারী সে নয় আর, একটা থ্যাঁৎলানো রক্তমাংসের পিণ্ড হ'য়ে গেছে। না—এই উৎকণ্ঠা অসহ্য, আমি আত্মাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে টেলিফোন তুলেছি: এনগেজ্‌ড। দু-মিনিট পরে তার গলা পাওয়ামাত্র বড্ড রাগ হ'লো আমার, জেগে উঠলো আমার ঈর্ষাবৃত্তি, অস্পষ্ট সব

অভিযোগ, সন্দেহ। 'অত্যন্ত, অত্যন্ত দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করো—কিন্তু মার্থা এলো এইমাত্র, আর' বেলাও ঘুমুচ্ছিলো না।' 'তবে যে তখন বললে ডোর-বেল বাজলো?' 'তখন জ্যানিটর এসেছিলো, আমার রান্নাঘরের সিঙ্ক্ সারাতে।' 'ও। তা একটু আগে তোমার টেলিফোন এনগেজড ছিলো কেন? কার সঙ্গে কথা বলছিলে?' 'আমি না—মার্থাকে ওর বয়-ফ্রেণ্ড ফোন করেছিলো।' 'তবে যে বললে এইমাত্র এলো মার্থা?' 'আহা—এইমাত্র মানে একটু আগে। মার্থাও ঢুকেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ওর ফোন।' 'সে এত দেরি করলো কেন?' 'ওর দিদিমাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলো।' 'দিদিমা মারা যাচ্ছেন?' এর উত্তরে ছোট্ট হাসি শুনলাম। 'তুমি তোমার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকো, আমি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি এক্ষুনি—কেমন?'

এতক্ষণ একটু সন্দিগ্ধভাবে ডলির কথাগুলি শুনছিলাম—জ্যানিটর, মার্থার বয়-ফ্রেণ্ড, দিদিমা, সবই বিশ্বাসযোগ্য শোনাচ্ছে, কিন্তু কে জানে, আসল কথাটা অন্য কিছু কিনা, সে নিজের মুখে যা বলবে তার বেশি তো জানার উপায় নেই আমার, তার দিনরাত্রির, সারা অতীতের, সারা জীবনের কতটুকুই বা জানি আমি। অপমান লাগছিলো টেলিফোনে তার হালকা-বলা কথাগুলোয়, যেন ব্যাপারটা তেমন জরুরি নয় তার কাছে, আসতে পারে তো ভালো, না-পারলেও তেমন আপশোশ নেই; যে-কোনো কারণেই হোক, এই দেরি করাটা যে কত অন্যায়, আমার পক্ষে কত কষ্টের, সে-বিষয়ে নিশ্চেতন যেন। কিন্তু শব্দবাহন কালো যন্ত্র থেকে শেষ কথাটি খ'সে পড়ামাত্র আমার মনের ভাব একেবারে বদলে গেলো; 'মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকো, আসছি এক্ষুনি—' এই কথাটা আমার মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুললো অন্য এক ডলিকে—ডলি—ডলরেস—ধলেশ্বরী—মুখে মধু, চোখে সত্য, আর হৃদয়ে যার বিশুদ্ধ মমতা। আমরা ঢুকে পড়েছি যে-কোনো একটা রেস্তোরাঁয়—ভাগ্যে খোলা ছিলো তখনও—মস্ত উঁচু সীলিংওলা ঘর, পাথরে তৈরি আঠারো-শতকী বাড়ি,

একটি লম্বা জোয়ান আধো-ঘুমন্ত ওয়েইটার আমাদের আপ্যায়ন করছে। এটারও প্রায় বন্ধ হবার সময়, কিন্তু লোকটি আমাদের তাড়া দিচ্ছে না, মস্ত শরীর নিয়ে তার চলাফেরা শিথিল, চোখের কোণ লালচে, মুখটা রেখা-পড়া, গম্ভীর। হয়তো তার তন্দ্রার ভাবটা কাটাবার জন্য, বা আমরা ছাড়া আর খদ্দের নেই ব'লে, দু-একটা আলাপ করলো আমাদের সঙ্গে (ডলিকে আমাকে স্বামী-স্ত্রী ব'লে ধ'রে নিয়ে)। খুব ধীরে ইংরেজি বলে সে, বুয়েনোস আইরেস-এ দেশ,—তার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর—আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো যেহেতু ঐ শহর আমি খুব সম্ভব জীবনে কখনো দেখতে পাবো না, কিন্তু ডলি তার সঙ্গে সোৎসাহে হিস্পানি বলতে শুরু করলো। আমাদের সামনে ব্রক্‌লি আর ব্রেইন-কাটলেট সাজানো, লোকটি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, ডলির চোখ বার-বার ছুটে যাচ্ছে তার দিকে; 'লোকটি হ্যাণ্ডসাম, তা-ই না? মুখটা ভারি ইণ্ট্রেস্টিং, তা-ই না—' 'দেখে মনে হয় অ্যাল্কহলিক, কী বলো?'—আমার কানে-কানে এমনি সব মন্তব্য করছে ডলি, আর মাঝে-মাঝে আমার হাতে চাপ দিচ্ছে, যেন আমাকে তার নিষ্ঠা বিষয়ে আশ্বস্ত করার জন্য, আর আমি ভাবছি কী হ'লো, কোথায় গেলো সেই বুক-মোচড়ানো বিরাট আগ্রহ, যা দু-ঘণ্টা আগে আমার প্রতিটি স্নায়ুকে কাঁপিয়ে তুলছিলো, ব্রডওয়ে আর একশো-দশের মোড়ে যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম? আর তার ট্যাক্সি যখন থামলো—সত্যি ডলি, এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর সত্যি তার সুন্দর, সুগন্ধি শরীর—আমার সেই মুহূর্তের আনন্দ এরই মধ্যে উবে গেলো কেমন ক'রে? তবে কি এরই জন্য তাকে ছেড়ে গিয়েছিলো জিম গর্ডন? তবে কি শুধু তাকেই ভালোবাসা যায়, যে কাছে নেই, বা ধরা দেয়নি? শুধু কি আমাদের বাসনার একটা উপচ্ছায়া ছাড়া ভালোবাসা আর-কিছুই নয়? তবে কি কাছে পাওয়ার চাইতে দূরে থাকাই ভালো? আমরা ভালোবাসতে চাই, সেই চাওয়া থেকেই জন্ম নেয় ক্ষণিকারা,

দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায় অন্ধকারে, সময়ের গর্ভে, স্বপ্নের গহ্বনে—তবু নতুন স্বপ্নেরও শেষ নেই। স্মৃতি থেকে স্বপ্ন, স্বপ্ন থেকে স্মৃতি—অফুরান। যেমন ধরো ভিয়েনার সেই ওয়েইট্রেস, পুষ্ট দেহ, টুকটুকে গাল, আমি যার দিকে আড়ে-ঠারে না-তাকিয়ে পারছিলাম না, ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ্-এর প্রোফেসরের সঙ্গে ডিনারের নিমন্ত্রণে এসে। এটাকে বলে 'গ্রীক ইন্', বহুকালের পুরোনো, ঠাণ্ডা পাথরের দেয়াল বেয়ে আইভি উঠেছে বাইরে, ভিতরে সারি-সারি কতগুলো অসমতল গুহা, কোনোটা দু-ধাপ থেমে, কোনোটা তিন ধাপ উঠে, দেয়ালের ব্র্যাকেটে ছোটো-ছোটো কম-আলোর বাতি—আধো-অন্ধকার, পালিশ-না-করা ওক-কাঠের টেবিলে চাদর নেই, কিন্তু আছে চার ভাষায় ছাপা বড়ো-বড়ো অক্ষরে এক বিজ্ঞপ্তি, সেটা প'ড়ে আমি চঞ্চল হ'য়ে উঠি। 'এই ইন্-এ আড্ডা দিয়েছেন বেটোফেন, মৎসার্ট, গ্যেটে, হাইনে; এখানে জন্ম নিয়েছে তাঁদের অনেক রচনার পরিকল্পনা।' অধ্যাপক 'গীতগোবিন্দ' বিষয়ে কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আমার কৌতূহল অদম্য হ'য়ে উঠেছে এই ইন্ বিষয়ে আরো অনেক তথ্য জানার জন্য। কতদিনের পুরোনো? সাত-শো বছর? সাড়ে-ছ'শো? বাড়িটা কী ছিলো আগে? মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের মঠ? না কোনো ওমরাহের দুর্গ? কী সেই ঘটনা, যার ফলে এটি পরিণত হ'লো সরাইখানায়? এখানে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আছে কি—গ্যেটে বা বেটোফেনের? অধ্যাপক ঠিক জানেন না, শুনেছিলেন এককালে, এখন মনে নেই—গত পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি সংস্কৃত চর্চায় ডুবে আছেন, অন্য কোনো দিকে মন দেবার সময় পাননি। 'ওয়েইট্রেসটিকে জিগেস করা যায় না?' প্রোফেসর তাকে জেরা ক'রে-ক'রে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন আমাকে, দেখা গেলো সেও খুব বেশি খবর রাখে না, কিন্তু তাতে তেমন ক্ষতি নেই আমার—আমি আরো দু-মিনিট ধ'রে দেখতে পেলাম এই মেদল নিটোল অরুণকান্তি পীনস্তনী রূপসীকে, যেন

রুবেন্সের ছবি থেকে উঠে-আসা, কোনো পৌরাণিক নায়িকা যেন ধূলির ধরায় নেমে এসেছে আমার গেলাশে মদ ঢেলে দেবার জন্য, এই আশ্চর্য গুহা যেন তারই সঙ্গে মিলনস্থল—কিন্তু এখান থেকে বেরোনোমাত্র আর তাকে দেখতে পাবো না কোনোদিন, কোনো ভোরবেলার ঝাপসা ধূসর স্বপ্নের মধ্যে সে ডুবে যাবে—আমার সিনসিনাটির হাসপাতালের সেই নিগ্রো নার্স দুটির মতো। আমাকে দেখামাত্র, কেন জানি না, উদ্বেল হ'য়ে উঠলো তারা, একজন বালিশে চাপড় দিচ্ছে, চাদর টান করছে আর-একজন (যদিও সবই ঠিক ছিলো); 'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, ডাক্তার আসবে এক্ষুনি—' বলতে-বলতে আমাকে প্রায় ঠেলে শুইয়ে দিলো (ডাক্তার এলে কেন শুতে হবে, তার কোনো ব্যাখ্যা না-দিয়ে) ; আমার মুখের উপর নিচু হ'লো দু-জনে দু-দিক থেকে, বিঁধলো আমাকে দুইজোড়া নিকষ-কালো মখমল-চোখ ; একজন বললো, 'আমার নাম জেনি, ওর নাম ফ্যানি, যে-কোনো কিছু দরকার হ'লে ডেকো আমাদের, নাম ক'রে ডেকো, যে-কোনো সময়ে, আমরা সারারাত আছি আজ—ঠিক তো? দ্যাট'স এ নাইস বয়।' আমি লাল হলাম, আমার বলতে ইচ্ছে হ'লো আমি 'বয়'ও নই, 'নাইস'ও নই, আমার বয়স বিয়াল্লিশ, আমি আমার দেশের একজন বাঘা সাহিত্য-সমালোচক, হেন লেখক নেই আমার কলমের খোচাকে যিনি ভয় না পান—কিন্তু আমি হাঁ করার আগেই 'তোমার গার্ল-ফ্রেণ্ড নেই?' ব'লে জেনি (বা ফ্যানি) আমার গায়ের উপর এতটা নিচু হ'লো যে তার বুক দুটি উপচে বেরিয়ে পড়লো আমার চোখের সামনে—মেঘলা রঙের, স্নিগ্ধ, ভরপুর তালফলের মতো, আমি বাধ্য হলাম চোখ নামিয়ে নিতে, তক্ষুনি ডাক্তার ঢুকলেন আর আমার কৃষ্ণসার হরিণীরা চকিত হ'য়ে স'রে গেলো। বুকে-পিঠে টোকা, ঠিক আছে সব, কিন্তু এই ওঅর্ডে আমার নাকি সুবিধে হবে না—কেন হবে না বুঝলাম না, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আমি বদলি হলাম একটি একা ঘরে, সেখানে আরাম অনেক বেশি কিন্তু জেনি নেই,

ফ্যানি নেই, তাদের কাছে বিদায় নেবারও সময় হ'লো না, আমার নানা-রঙিন কল্পনার আকাশে একটি নিকষ-কালো আঁচড় কেটে তক্ষুনি তারা অদৃশ্য হ'লো। আমার চোখের সামনে বরফে-ঢাকা শাদা পৃথিবী, কিন্তু মনের মধ্যে কালো আরো দীপ্ত, কোমল কালো গভীর চোখ, আর কোঁকড়া কালো উত্তাল চুল ঢেউ তুলছে। সে কি ছিলো না এক নতুন সৌন্দর্য, যা ঝিলিক দিয়েছিলো আমার সামনে—মুহূর্তের জন্য? আমার মনে হ'লো আসলে ওরা প্রগল্‌ভ নয়—ঐ জেনি আর ফ্যানি—হয়তো আমাকে বিদেশী দেখে করুণা করেছিলো, হয়তো তাদের স্নেহবৃত্তি অতৃপ্ত, হয়তো তাদের নিঃসঙ্গতায় যে-কোনো ক্ষণিক সান্ত্বনা তারা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কেনই বা অন্য কথা ভাবছি যখন জ্যান্ত ডলি আমার কাছে উপস্থিত, এই লম্বা দিন শেষ হ'লো অবশেষে, আর ন-দিন আছি এখানে, রাত এখন নিশুতি, অন্ধকারে ডলির চোখ তারার মতো জ্বলছে—ধ'রে নেয়া যাক এই বিশ্বজগতে আর-কিছু নেই, শুধু আছি পরস্পরের আমরা দু-জনে, আমি তার বুকে মাথা রেখে আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছি। আ, এই সেই শান্তি, যার মতো ভালো আর-কিছুই নেই, যার জন্য ভুলে থাকা যায় মিকেলাঞ্জেলো, টোমাস মান্, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, দায়িত্ব, মৃত্যুভয়—সব। যেন ঘুমের মধ্যে আর-এক পল্লা ঘুম, এক জীবন-ডোবানো আশ্বাস—কয়েক দিনের, কয়েক ঘণ্টার, কয়েক মুহূর্তের। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি ডলির বুকে মাথা রেখে, আমি জেগে উঠছি, না কি স্বপ্ন দেখছি? ঐ পিঁপড়েগুলো করছে কী ওখানে? একটা মরা ফড়িং টেনে নিয়ে চলেছে—আমার শেলফের উপর থেকে, জানলার তাকের উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের গর্তে, বাসায়—এক বিপুল ভোজ। কী শক্তি, কী দার্ঢ্য, আর গতির কী বেগ। মনে হচ্ছে ফড়িংটির পাখা ক্ষীণভাবে নড়ছে মাঝে-মাঝে—পুরোপুরি ম'রে গেছে কি, না কি ওরা মুমূর্ষুর শরীরেই আটকে দিয়েছে ওদের আঠার মতো দাঁড়া, আমি কি ফড়িংটাকে মুক্তি দেবো যন্ত্রণা থেকে? একটা

বই তুলে চাপ দিলাম আমি, ফড়িং চেপ্টে গেলো, কিন্তু পিঁপড়ে একটাও মরলো না, ঠিক তেমনি আটকে আছে দাঁড়াগুলো। এক, দুই, চার, বারো—ঠিক চোদ্দটা, এত ছোটো যে চোখে ঠিক মালুম হয় না (আমাকে তিন বার গুনতে হ'লো), তাদের তুলনায় ফড়িংটা ততই বড়ো, যত বড়ো আমাদের তুলনায় হাতি। আমার শেলফে কাগজপত্র বইয়ের স্তূপ উঁচু হ'য়ে আছে, জানলার তাক নিচুতে, তারপর আবার জানলা বেয়ে উঠে নেমে যেতে হবে বাইরের দেয়াল বেয়ে—কী সহজে এই বিপদসংকুল বন্ধুর পথে চড়াই-উৎরাই করছে ওরা, কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োয় উঠে নেমে যাচ্ছে উপত্যকায়—যে-কোনো বাধা টপকে যাচ্ছে বা এড়িয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো, আমাদের হিশেবে ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে—ঐ অণুপরিমাণ আশ্চর্য জীব। আমি একটা পোস্টকার্ড দিয়ে ওদের বাধা দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু বেড়া দিয়ে বন্যা ঠেকাবার চেষ্টা যেমন, এও তেমনি—ওরা পিলপিল ক'রে বেয়ে উঠছে, টপকে যাচ্ছে—ওরা দুর্বার, ওরা অজেয়। একটা-দুটোকে আমি আঙুলে টিপে মেরেও ফেললাম, তক্ষুনি অন্য দু-জন তাদের জায়গা নিলো, বাহিনী ছত্রভঙ্গ হ'লো না। আমি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম এই বিক্রমাদিত্যের বিজয়যাত্রা—মুগ্ধ, কিছুটা ভীত, যেন এই অমানুষিক শ্রম চোখে দেখেও ক্লান্ত হয়েছি আমি, তারপর টের পেলাম বাইরে ট্রামের শব্দ, এই সকালবেলাতেই শুরু হ'য়ে গেছে কলকাতার জ্যৈষ্ঠ-মাসের গরম—এক লম্বা গরম ভীষণ দিন আমার সামনে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই উঠতে হবে আমাকে, দাড়ি কামাতে হবে, নাইতে হবে, ভাবতে হবে কী দিয়ে ভরানো যায় এই দিন, এতগুলো ঘণ্টা, আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত। আমি তো পিঁপড়ের মতো বলবান নই, আমার আশ্রয় কোথায়?

ভূস্বর্গ

প্রবাসী-

'নমস্কার,' আমি ক্যাম্পে পৌঁছনোমাত্র আমাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন আমার পূর্বপরিচিত ডক্টর শঙ্করদাস বটব্যাল, নৃতত্ত্ববিদ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল বিষয়ে ভারত-সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। 'এঁরা আমার সহকর্মী : ডক্টর মাহেশ্বর, জয়পুর ইনস্টিট্যুট অব বায়ো-কেমিস্ট্রির ডিরেক্টর; ত্যাগরাজ বড়ুয়া, ভাষাবিজ্ঞানী; আর ইনি হেমকান্ত ভৌমিক, সর্বভারতীয় মনোবিজ্ঞানী-সংস্থার স্থাপয়িতা। আপনাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আনন্দিত, আশা করি আপনিও এখান থেকে কিছু সঞ্চয় নিয়ে ফিরতে পারবেন। আসুন—আমাদের প্রাতরাশ তৈরি। আজ শীত খুব কম, তাই তাঁবুর বাইরে টেবিল দিতে বলেছি।'

'আপনার আসতে কষ্ট হ'লো, জানি,' খেতে-খেতে ডক্টর বটব্যাল আবার বললেন, 'কলকাতা থেকে প্লেনে গৌহাটি, সেখান থেকে হেলিকপ্টারে কোহিমা, তারপর দেড়শো মাইল পাহাড়ি পথে জীপ;—জায়গাটা সুগম নয় এখনো, কিন্তু আপনি যা দেখবেন তার তুলনায় ওটুকু কষ্ট নগণ্য। না, আমি নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা বলছি না, যদিও সেটাও উল্লেখের অযোগ্য নয়; আমি লক্ষ করছি আপনি মাঝে-মাঝে বেকন-ডিম ভুলে গিয়ে সপ্রশংসভাবে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত না-ক'রে পারছেন না। আপনার সামনে ঐ উঁচু পাহাড়টার নাম হ'লো জাপভো, আপনার বাঁয়ে বরাইল পর্বতমালা দিগন্তকে প্রায় আটকে রেখেছে; কিন্তু ওরই মধ্যে ঐ যে কুয়াশার মতো একটু ফাঁক দেখছেন, সেখানেই, এক ক্ষুদ্র উপত্যকায়, পর্বতবেষ্টিত আক্কাট বনের এক গহ্বরে লুকিয়ে আছে আমাদের আশ্চর্য আবিষ্কার, যা আপনাকেও আমাদেরই মতো ভাবিত করবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। "মহাভারতে মানুষ ও দেবতা" বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অংশত মনোজ্ঞ প্রবন্ধটি আমি পড়েছিলাম ব'লেই আপনাকে এই দুরধিগম্য ভারতসীমান্তে আসার জন্য প্ররোচিত করলাম। আমরা কয়েকটি সত্যিকার দেবদেবীর সন্ধান পেয়েছি, সিদ্ধেশ্বরবাবু।'

'ও-ভাবে বললে অত্যন্ত বেশি অত্যুক্তি হয় না,' মৃদু হেসে ডক্টর মাহেশ্বর বললেন। 'আমাদের মানতেই হবে, মহাভারতের বর্ণিত দেবতার কয়েকটি লক্ষণ ওরা সম্প্রতি অর্জন্ করেছে ; ওদের দেহে গড়ে স্বেদক্ষরণ হয় সপ্তাহে মাত্র এগারো দশমিক সাতাশি গ্রাম্—আধ আউন্সেরও কম ; ওদের চোখে মিনিটে চারবারের বেশি পলক পড়ে না ; আর প্রায় সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ অবস্থায় ওরা সময় কাটায়।'

'"সময়" কথাটা ঠিক প্রযোজ্য নয় এখানে,' বললেন হেমকান্ত ভৌমিক, 'বরং এ-ভাবে বলা ভালো যে ওরা যেহেতু ধ্যানস্থ আই ওরা সময়ের বাইরে চ'লে গেছে। ওদের আধো-বোজা চোখের তলায় টর্চ ফেলে, ওদের ভাবকুঞ্চনহীন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, ওদের মস্তিষ্ক-কোষে বৈদ্যুতিক শক্ চালিয়ে—আমি নিশ্চিত জেনেছি যে ওরা কখনো স্বপ্ন দ্যাখে না ; আর তা-ই থেকে আমার সিদ্ধান্ত এই যে স্মৃতি ও চিন্তার দ্বারা ওরা বিড়ম্বিত নয়। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলে চিত্তভ্রংশ—ডিমেনশিয়া ; অথচ পারিভাষিক অর্থে উন্মাদ ওদের বলা যায় না, অতএব ওদের ভবযন্ত্রণাহীন দেবদেবী ব'লে কল্পনা করার লোভ হয় বইকি। তবে—সুখের বিষয়—একটি মৌলিক জৈব লক্ষণ ওরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ; ওরা মরণশীল—বর্তমানে মরণাপন্ন।'

'এক বছর আগে আমরা যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম,' কথাটা আবার তুলে নিলেন ডক্টর বটব্যাল, 'তখন ওদের এতদূর পর্যন্ত অবক্ষয় ঘটেনি ; তখনও ওরা চ'লে-ফিরে বেড়ায়, কিছু কথাবার্তাও বলে। ওদের ভাষা—পঞ্জাবি, ভোজপুরি, চাটগাঁর বাংলা আর চাখেসাং উপজাতির ভাষা মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি বুলি—সেটা বুঝতে প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিলো আমাদের ; তাছাড়া বাচনভঙ্গি এত অস্পষ্ট আর গলার আওয়াজও এত নিচু যে হঠাৎ মনে হয় কোনো পোকা হয়তো মানুষের ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। ওদের উনপঞ্চাশজনের মধ্যে আমরা প্রথমে একজনকে বেছে নিলাম—স্পষ্টত সে-ই দলপতি—

আয়তলোচন, তীক্ষ্ণনাসা, শালপ্রাংশু, গৌরবর্ণ এক পঞ্চনদভূমির সন্তান, আমরা তার নাম দিয়েছি বীরসিং, যদিও ঐ নামটা যে "তার" সেটা তার মাথায় ঢোকাতে পারিনি। অনেক ধৈর্যে, অনেক পরিশ্রমে অল্প-অল্প ক'রে কথা বলালাম তাকে এবং আরো কয়েকজনকে দিয়ে, তিনজন পুরুষ ও দু-জন মেয়ের প্রতিটি কথা টেইপ ক'রে নিয়ে আমরা চারজনে মিলে শুনলাম অনেকবার, প্রোফেসার বড়ুয়া দু-খাতা ভর্তি নোট নিলেন; এমনি ক'রে, প্রায় দু-মাসের চেষ্টায়, অন্য দু-একটা অনুমানের সাহায্যে, ওদের ইতিহাস মোটামুটি উদ্ধার করা গেলো।'

'ঠিক উদ্ধার নয়, পুনর্নির্মাণ,' মন্তব্য করলেন ত্যাগরাজ বড়ুয়া। 'সবগুলো শব্দ আমরা যে ঠিক শুনেছি বা ঠিক বুঝেছি সে-বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হ'তে পারিনি। আমি টেইপগুলো থেকে যে-কটি ফলাফল পেয়েছি তা এই: ওরা পাঁচজনে মিলে ব্যবহার করেছিলো মাত্র তিনশো-ছাব্বিশটি শব্দ (তার মধ্যে প্রধান বক্তা বীরসিং একশো একাত্তরটি); শব্দগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় চল্লিশটি অস্ট্রিক, সাঁইত্রিশটি সংস্কৃতজাত, বাকি তেইশটি ভোটবর্মি। কিন্তু উচ্চারণ শোচনীয়ভাবে বিকৃত, ক্রিয়াপদে নিত্যবর্তমান ছাড়া বচন নেই, সংখ্যাবাচক শব্দ একটিও পাইনি; তাই ঈষৎ অসতর্ক না-হ'য়ে বলা যায় না যে আমরা যা অর্থ করেছি ওরাও ঠিক তা-ই বলতে চেয়েছিলো। আর, না-বললেও চলে, আমরা যা শুনেছি তা কোনো গোষ্ঠীস্বীকৃত ভাষা নয়, তা একটি সম্ভবপর নতুন ভাষার ভ্রূণাবস্থা, আসলে তাও নয়, তার গর্ভপাত। অথচ, ভাবতে দুঃখ হয়, ঐ ডিঙ্গু উপত্যকার আঙ্কাট বনের মধ্যে, অনার্য রমণীদের সঙ্গে গাঙ্গেয় পুরুষদের মিশ্রণের ফলে, হয়তো আরো একটি নতুন উপভাষার সৃষ্টি হ'তে পারতো ভারতবর্ষে—যদি না ঐ মারাত্মক গুল্ম দৈবাৎ খুঁজে পেতো ওরা।'

'তবে কয়েকটা তথ্যকে বোধহয় স্বীকার্য ব'লে ধ'রে নেয়া যায়,' বলতে লাগলেন ডক্টর বটব্যাল। 'ঐ আটাশজন পুরুষ আজাদ হিন্দ

ফৌজে সৈনিক ছিলো ; চব্বিশ বছর আগে যখন বর্মা-ভারত সীমান্তে যুদ্ধ চলছে তখন কোনোক্রমে ব্যাটালিয়ন থেকে ছিটকে পড়ে, নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়ে ডিঙ্গু উপত্যকায়. তারপর বিবিধ কারণে আবদ্ধ থেকে যায় সেখানেই। কী সেই ঘটনা—মার্কিনপোষিত ইংরেজের গুলিগোলা, না জাপানিদের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, না কি অন্ধকার বা বর্ষার সুযোগে ওদেরই স্বেচ্ছাকৃত পলায়ন—যার ফলে ঐ আটাশজন যূথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা সঠিকভাবে জানার কোনো উপায় নেই, আমাদের দিক থেকে প্রয়োজনও নেই। কিন্তু জঙ্গলে সন্ধান ও খনন ক'রে যে-সব জিনিশ পাওয়া গেছে তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হয় : পেতলের বোতাম, খাকি মিলিটারি কোর্তা (যা আজ্বাদ হিন্দ ফৌজের য়ুনিফর্ম ব'লে শনাক্ত হয়েছে), জাপানে তৈরি রাইফেল, চাখেসাংদের ঘরোয়া তীর-ধনুক, আর সবচেয়ে ইঙ্গিতময়—কয়েকটি করোটি, পুরুষ মেয়ে ও শিশুর কঙ্কাল ; আরো ব্যাপকভাবে খনন করলে আরো বেরোনো সম্ভব ব'লে মনে হয়। দলের মেয়েরা কোত্থেকে এলো, এ-কথা বার-বার জিগেস ক'রে বীরসিংহের মুখে উত্তর পেয়েছিলাম, "ওরৎ বম্‌রুখ," প্রোফেসর বড়ুয়ার মতে যার অর্থ হ'লো, "ঐ মেয়েরা আমাদের," বা "ওরা আমাদের স্ত্রী" (চাখেসাং ভাষায় "বমারু" মানে আমাদের, আর ওরৎ অবশ্য "আউরৎ"-এর অপভ্রংশ)—সর্বনামের বহুবচন লক্ষণীয়। কিন্তু কী ক'রে ঐ একুশটি মেয়ে "ওদের" হ'লো, সে-বিষয়ে কিছুই বের করা গেলো না ওদের মুখ দিয়ে—হয়তো তা ওদের মনেও ছিলো না ততদিনে ; কিন্তু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে আমরা তা অনুমান ক'রে নিতে পেরেছি। ঐ আটাশজন যেখানে এসে পৌঁচেছিলো সেটা স্পষ্টতই একটা চাখেসাংপল্লী ; নবাগতদের তীর-ধনুক নিয়ে আক্রমণ করে চাখেসাংরা, উত্তরে ওরা গুলি চালাতে থাকে—স্ত্রীলোক দেখতে পেয়ে, বলা বাহুল্য, সৈনিকদের রণস্পৃহা আরো উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো। যতদূর মনে হয়, একটি নিষ্ঠুর হত্যা ও নারীধর্ষণকাণ্ড

অনুষ্ঠিত হয় ডিঙ্গু উপত্যকায়, চব্বিশ বছর আগে। হয়তো অরণ্যনিহিত আদিবাসিরা আগে কখনো আগ্নেয়াস্ত্র দ্যাখেনি; ওর ক্ষমতা বিষয়ে অনভিজ্ঞতাবশতই বহু লোক নিহত হয়; অবশিষ্টেরা—বাস্তুভিটা ও আহতদের পরিত্যাগ ক'রে পালাতে গিয়ে হয়তো অনাহারে বা শ্বাপদের মুখে প্রাণ হারায়। খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ীদের হাতে ধৃত হ'লো একুশজন চাখেসাং রমণী—মাথা-পিছু একের চাইতে সাতজন কম।'

'আর তারপর,' ডক্টর মাহেশ্বর বাঁকা হেসে বললেন, 'সম্ভবত তার অল্প পরেই ওরা সর্বনাশী লোংচু ফলের স্বাদ পেলো—আমরা কিছুটা ব্যঙ্গার্থে যার নাম দিয়েছি আম্ব্রোসিয়া ইণ্ডিকা।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম এতক্ষণ, এবারে একটা প্রশ্ন না-করে পারলাম না, 'লোংচু? আম্ব্রোসিয়া ইণ্ডিকা? সেটা কী ব্যাপার?'

'সেটা যে কী তা নিয়ে দেশে-বিদেশে গবেষণা চলছে,' উত্তর দিলেন মনোবিজ্ঞানী হেমকান্ত ভৌমিক। 'হয়তো কোনো যুগান্তরকারী ভেষজ বেরোবে তা থেকে, বা বিজ্ঞান আরো একবার পরাস্ত হবে প্রকৃতির কাছে;—সঠিকভাবে কিছু বলার মতো সময় এখনো আসেনি। কিন্তু কী ক'রে ঐ কল্পনাতীত উদ্ভিদের আমরা সন্ধান পেলাম সেটা আপনাকে আগে শোনাতে চাই। আমরা যখন ঐ উনচল্লিশজনের পল্লীতে প্রথম যাতায়াত শুরু করি, তখন আমাদের সবচেয়ে বেশি চমক লেগেছিলো ওদের যৌন জীবনের প্রকাশ্যতায় ও ব্যাপ্তিতে। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা—দিনের যে-কোনো সময়ে আমরা ওদের মৈথুনরত দেখতাম, উঠোনে ঘাসের উপর, ঘরের দাওয়ায়, আশে-পাশে বনের মধ্যে ঝরা পাতার বিছানায়; কখনো কয়েকজন ব্যস্ত আর অন্যেরা দর্শক, আর কখনো বা এক উন্মুক্ত ও সমবেত রতিমহোৎসবে একই সঙ্গে উনচল্লিশজন নিয়োজিত। মেয়েদের সংখ্যাল্পতার জন্য কোনো-কোনো নারী বিভিন্ন উপায়ে একাধিক পুরুষের সঙ্গে সংগত হচ্ছে; এক মহাকামিনীকে দেখেছিলাম—বাড়ির তিন দরজায় আগত তিন অতিথির যুগপৎ তৃপ্তি-

সাধন করছে, আমাকে মানতে হবে আমার প্রবীণ জ্ঞাননেত্রেও এর প্রত্যাঘ্যাত অনুভূত হয়েছিলো, কিন্তু আমাদের উপস্থিতি দেবদেবীদের কিছুমাত্র আড়ষ্ট বা বিব্রত করতে পারেনি। আমরা প্রথম-প্রথম গাছ-পালার আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখতাম, ছবি নিতাম, কিন্তু ক্রমে আমাদের সন্দেহ হ'লো এরা এদের পারিপার্শ্বিক বিষয়ে নিশ্চেতন, প্রায় দশায়-পড়া ভক্তের মতো বাহ্যজ্ঞানহীন—আস্তে-আস্তে আমরা এগিয়ে গেলাম, খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তবু এরা একইরকম নির্বিকার হ'য়ে রইলো। আমাদের সভ্যতা দ্বারা কলুষিত দৃষ্টি কত যে পীড়িত হয়েছিলো সেই সব দৃশ্যে, কত কঠিন চেষ্টায় দমন করতে হয়েছিলো ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও নিজেদের ইন্দ্রিয়পীড়ন, আপনার মতো একজন সহৃদয় সাহিত্যিককে তা বলা বাহুল্য, সিদ্ধেশ্বরবাবু। কিন্তু আমরা বৈজ্ঞানিক ; আমাদের কাছে একটি সদ্য-ফোটা গোলাপের চাইতে একটি শটিত শব কম হৃদয়গ্রাহী নয় ; জগতের চোখে যা অসহনীয়রকম কুৎসিত ও অশ্লীল, আমাদের চোখে তাও সম্ভাব্য জ্ঞানের উপাদান। ক্রমশ, ওদের আচার-আচরণে অভ্যস্ত হবার পর, আমরা কয়েকটি অদ্ভুত জিনিশ লক্ষ করলাম। ওদের যে শুধু লজ্জা নেই তা নয়, ঈর্ষাও নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নেই, যৌন-ক্রিয়ায় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর বিষয়ে কোনো অধিকারবোধ নেই ; সব নারী স্বাধীনা ও সামান্যা, সব পুরুষ স্বেচ্ছাচারী। সম্পত্তিহীন, সংঘর্ষহীন, পাপবোধহীন, দাসত্বহীন, প্রভুত্বহীন এক আদর্শ সমাজে বা সমাজহীনতায় ওরা অবস্থিত ; ওরা যেন স্বর্গের প্রসূন, আদিমতম স্বর্ণযুগের সন্তান। আমাদের বিস্ময় ও মুগ্ধতা প্রায় অসীমে পৌঁছলো।'

'আর তারপরেই,' ডক্টর মাহেশ্বর বলতে লাগলেন এবারে, কয়েকটি প্রশ্ন দুর্বারভাবে আক্রমণ করলো আমাদের। কেন ওদের মধ্যে যৌন-ক্রিয়ার বিস্তার এত বেশি যে সেটাকেই ওদের প্রধান কৃত্য বলা যায় ? আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরা অন্য সব ব্যাপারেই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট, মনুষ্যোচিত অন্য কোনো বৃত্তির কোনো পরিচয় দিচ্ছে না, আমরা যাকে "কাজ"

বলি ওদের জীবনে তা অস্তিত্বহীন—তাহ'লে ওদের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিই বা কী ক'রে হয়? আর কেনই বা ঐ মৈথুনোন্মাদ অতি সমর্থ স্ত্রী ও পুরুষদের একটিও সন্তান নেই? কেন নেই সারা পল্লীতে কোনো শিশু বা বালকবালিকার চিহ্ন? এই সঙ্গে আরো কঠিন একটি প্রশ্ন যুক্ত হ'লো, যখন বীরসিংয়ের অনিচ্ছুক সহায়তায় ওদের পূর্ব ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম। চব্বিশ বছর আগে যারা ছিলো সৈনিক, আর যারা ছিলো ভোগ্যা রমণী, তাদের বয়স এখন পঞ্চাশ অথবা ষাটের উর্ধ্বে হওয়া উচিত, খুব কম ক'রে ধরলেও উত্তরচল্লিশ নিশ্চয়ই—অথচ ঐ উনচল্লিশের মধ্যে এমন একজনও নেই, যার চক্ষু, কেশ, ত্বক বা অন্য কোনো অঙ্গ অতি সূক্ষ্মভাবেও জরাস্পৃষ্ট, যাকে দেখে মনে হয় না শারীরিক স্বাস্থ্যে ও যৌবনে ভরপুর। এ কি সম্ভব? না কি আমরাই সব ভুল দেখছি, ভুল ভাবছি? এ-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে-খুঁজে আমরা যখন উদ্‌ভ্রান্ত, তখন লক্ষ করলাম যে সারাদিনে ওদের খাদ্য হ'লো একটি বা দুটি শুকনো ফল, যা প্রথমে আমরা মনাক্কা ব'লে ভুল করেছিলাম। বীরসিংকে অনেকক্ষণ জেরা করার পরে তার মুখ থেকে "লোংচু" কথাটা বেরিয়ে পড়লো। আমরা রহস্যের চাবি খুঁজে পেলাম, কিন্তু এখন দেখছি চাবিটাও রহস্যময়!' ডক্টর মাহেশ্বর নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

'লোংচু!' পরমুহূর্তেই ব'লে উঠলেন হেমকান্ত ভৌমিক, 'আস্কাট বনে স্বচ্ছন্দজাত, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তার প্রথম ভোক্তা হ'লো খুব সম্ভব বীরসিং, আর তারপর তার দলভুক্ত অন্যেরা। চাখেসাংদের তাড়িয়ে দেবার পর এরা প্রথম কিছুদিন কী-ভাবে কাটিয়েছিলো, তা কল্পনা করা শক্ত নয়; ফেরারি সেপাই, ইংরেজ সরকার আর আজাদ হিন্দ দুয়েরই মতে "বিদ্রোহী", দূরে লোকালয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছে না, খাদ্যের খোঁজে বনে-বনে ঘুরছে, গুলিগোলা নিঃশেষ ব'লে চাখেসাং তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করছে পাখি, খরগোস ইত্যাদি, গলা-চুলকোনো বুনো আনাজ কুড়িয়ে খাচ্ছে। এই অবস্থাতেই দৈবাৎ একদিন ফলটি দেখতে

পেয়েছিলো বীরসিং, দেখার পরে ভক্ষণ না-ক'রেও পারেনি—ঠিক দৈবাৎ হয়তো নয়, তার সাহস আর কৌতূহল সাধারণের চাইতে বেশি ছিলো ব'লেও। আমরাও ফলটি খুঁজে পেয়েছি, সিদ্ধেশ্বরবাবু, যদিও—বলা বাহুল্য—তার স্বাদগ্রহণ থেকে সাবধানে বিরত রেখেছি নিজেদের। ফলগুলি অরুণবর্ণ ও ডিম্বাকৃতি, উপরের অংশটা সূক্ষ্ম, হঠাৎ দেখলে মনে পড়ে কোনো দুগ্ধবতী যুবতীর স্তনাগ্র, যা পানতৃপ্ত শিশুর ঠোঁট থেকে এইমাত্র খ'সে পড়েছে। ঘন পল্লবযুক্ত একটি গুল্মে এরা জন্মায়, অরণ্য যেখানে নিবিড় শুধু সেখানেই—পাতার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে সহজে চোখে পড়ে না, যেন মানুষকে এই মারাত্মক নেশা থেকে বাঁচাবার জন্যই প্রকৃতির এই কৌশল। এখানকার জমির উর্বরতার তুলনায় ফলনও তেমন প্রচুর নয় এদের, আমরা আঙ্কাট বনে অনেক ঘোরাঘুরি ক'রেও বারোটির বেশি লোংচু ঝোপ দেখতে পাইনি; ফল ধরে শরৎকালে, বছরে একবার মাত্র। আমরা লক্ষ করেছি, ফলগুলি পশুপাখিদের দ্বারা অভুক্ত ও অস্পৃষ্ট থেকে যায়—তাদের জান্তব স্বজ্ঞা রক্ষা করে তাদের, নয়তো অনেক আগেই আঙ্কাট বনের নিরামিষভোজী প্রাণীদের বংশলোপ হ'তো। এখন এই লোংচুফলের গুণপনার কথা শুনুন: লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার বসু-বিজ্ঞানমন্দির ও লক্ষ্ণৌয়ের বায়লজিকাল ল্যাবরেটরি থেকে এ-পর্যন্ত আমরা যে-সব রিপোর্ট পেয়েছি সেগুলি মোটামুটি পরস্পরের সমর্থক: ইঁদুর, খরগোশ ও গিনিপিগের উপর পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে ফলটি অবিশ্বাস্যভাবে কামোদ্দীপক ও রেতঃবর্ধক; শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত সেবন করলে তা যৌবনকে স্থায়িত্ব দিতে পারে; শুকনো অবস্থায়, বা শীতাতপের তারতম্য ঘটলে তার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; কিন্তু এই সব আশ্চর্য বরের বিনিময়ে তা সম্পূর্ণ হরণ ক'রে নেয় প্রজননশক্তি। কলকাতায় ব্যাং আর টিকটিকির উপরেও পরীক্ষা করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের কোনো পরিবর্তনই হয়নি; এ থেকে বোঝা গেছে

যে শুধু উষ্ণরক্তবান প্রাণীরাই লোংচুর দ্বারা উপকৃত বা নিহত হবার যোগ্য— হয়তো সবচেয়ে বেশি যোগ্য মানুষ ও তার নিকট জ্ঞাতিরা। ব্রন্‌ক্স্‌ চিড়িয়াখানায় এক বৃদ্ধ শিম্পাঞ্জি এক সপ্তাহ লোংচুসেবনের পরে এমন প্রচণ্ড কামোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়েছিলো যে—যথোচিত সংখ্যক শিম্পাঞ্জিনীর অভাবে—তাকে মার্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।'

'ব্যাপারটা হয় কী, জানেন—' হেমকান্তবাবুর মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিলেন ডক্টর মাহেশ্বর, 'লোংচুফল জীবদেহের মেটাবলিক ক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ ক'রে দেয়, উদ্যমের ব্যয় নূনতম মাত্রায় এসে ঠেকে, তন্তু ও কোষের ক্ষয় অণুপরিমাণ হয় মাত্র, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শিরাগুলি কাঠিন্যলাভ করে না—অর্থাৎ, অন্তত আপতিক দৃষ্টিতে—লোংচুসেবীরা চিরযৌবন লাভ করে। আর যেহেতু ঐ ফলের মধ্যেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী জল ও খাদ্যপ্রাণ আছে—আবর্জনাহীন বিশুদ্ধ ও সংহতভাবে—তাই স্থূলতর খাদ্য উৎপাদন বা উপার্জনের শ্রম থেকে তা মুক্তি দেয় মানুষকে। এখন কথাটা হচ্ছে: মেটাবলিক ক্রিয়া যদি অত্যন্ত কমিয়ে দেয়া হয় তাহ'লে যৌন ক্ষমতাও হ্রাস পেতে বাধ্য, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার ঠিক উল্টোটাই ঘটছে কেন? লেলিনগ্রাদের অধ্যাপক অস্ট্রভস্কি আর বার্কলির ডক্টর ল্যাংটন-স্মিথ দু-জনেই স্বাধীনভাবে এই অদ্ভুত স্ববিরোধ লক্ষ করেছেন: লোংচু শুধু যৌন গ্রন্থি ও ক্ষরণের পক্ষে তেজস্কর, কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়েই মান্দ্যসাধক। তেমনি আশ্চর্য: আমাদের পরিচিত অন্য সব মাদকেরই মাত্রা ক্রমশ না-বাড়ালে কোনো ফলাফল হয় না; কিন্তু লোংচুতে অভ্যস্ত হ'লে তার পরিমাণ নিজে-নিজেই ক'মে যেতে থাকে; এই যেমন আমাদের উনপঞ্চাশজনের পক্ষে দৈনিক একটি-দুটি ক'রে ফলই এখন যথেষ্ট। এই সব সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হবার কারণ ছিলো, যদি না সম্প্রতি ঐ বীরপল্লীতেই সমাধানের ইঙ্গিত পেতাম। আমরা প্রথমে এসে যা দেখেছিলাম, আর আপনি

আজ ওদের যে-অবস্থায় দেখবেন, সিদ্ধেশ্বরবাবু—এ-ত্বয়ের মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। এখন ওদের নিষ্ক্রিয়তা এতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত যে মৈথুনেও আর আসক্তি বা সচেষ্টতা নেই ; ওদের পেশীগুলি সর্বদাই শিথিল, ধমনীস্পন্দন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, স্নায়ুতন্ত্র একেবারে নিঃসাড়। কিন্তু যেহেতু দৃশ্যত ওদের যৌবন একেবারে পূর্ণোজ্জ্বল, দেহে কোথাও রোগলক্ষণ নেই, তাই ওদের চোখে দেখে মুমূর্ষু ব'লে ধারণা করা যায় না, বরং মনে হয় দেবতুল্য কোনো অলৌকিক জীব।'

'ভাষাতত্ত্বের দিক থেকেও ঐ ধরনেরই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি আমি,' মৃদু হেসে ত্যাগরাজ বড়ুয়া বলতে লাগলেন। '"লোংচু" কথাটার ব্যুৎপত্তি কী, আক্ষরিক অর্থ কী, এ-সব প্রশ্ন বেশ ভাবিয়েছে আমাকে। যদি বীরসিং-গোষ্ঠী ঐ ফলের আবিষ্কারক হয়, তাহ'লে কি নামকরণও ওদের ব'লে ধ'রে নেয়া যায়? এই ধারণাটি নিয়ে বেশ কিছুদিন খেলা করেছিলাম আমি, কিন্তু পরে তা বর্জন করতে বাধ্য হই। বিশ্বভারতীর চীনা ভবনের একটি গবেষক আমাকে জানালেন যে খৃষ্টপরবর্তী ছয় শতকের ক্যাণ্টনীয় কথ্য বুলিতে "লুংচুী" অর্থ ছিলো স্বর্গধাম। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওজিহারাকে চিঠি লিখে জানলাম, আট শতকের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "মান্‌য়িওশু"তে (যার সঙ্গে "মেঘদূতম্"এর তুলনা ক'রে মূল্যবান একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ওজিহারা) "রাংচাই" কথাটা একুশবার পাওয়া যায়, যার অর্থ সেকালে ছিলো "পিতৃগণের পুণ্য বাসভূমি"। জাপানি বর্ণমালায় "ল" নেই, বিদেশী শব্দের ঐ ব্যঞ্জন জাপানি উচ্চারণে "র" হ'য়ে যায় ; এবং শিণ্টো ধর্মে "পিতৃগণ" ও "দেবগণ" সমার্থক ; এ থেকে মনে করা যায় যে "লুং-চী"রই জাপানি রূপ হ'লো "রাংচাই"। এর পরে চোদ্দটি আদিবাসী গ্রামে ঘুরে-ঘুরে আমি জানলাম যে তাদের মধ্যে বংশপরম্পরায় একটি সংস্কার চ'লে আসছে—কোনো-এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন ফল, যার স্বাদ একবার

নিলে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আধিব্যাধি কিছুই থাকে না, তারই নাম চাখেসাং ভাষায় "লোংচু" বা "লিংচিন" বা "লাংচাই", আর পশ্চিম অঞ্চলের অঙ্গামিদের ভাষায় "চংগালু", : চাখেসাংদের মতে শব্দটা মুখে আনতে পারে শুধু রজস্বলা নারীরা; পুরুষ, বালক, বালিকা বা বৃদ্ধা তা উচ্চারণ করলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। এ-সম্পর্কে আরো যে-সব কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ উপকথা শুনলাম, তা বিবৃত করার সময় এখন নেই, সিদ্ধেশ্বরবাবুর কৌতূহল হ'লে, সন্ধের পরে শোনাবো আপনাকে। তবে এ-বিষয়ে আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে আমাদের বীরপল্লীর কোনো চাখেসাং রমণী, ঐ ফল ভক্ষণ ক'রে অতিশয় আহ্লাদিত হ'য়ে তার ছেলেবেলা থেকে শোনা "লোংচু" কথাটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো। তিব্বতি 'লোচ' শব্দ, যার অর্থ পুংজননেন্দ্রিয়, যা থেকে প্রাকৃত বাংলায় "লুচ্চিয়া" বা "লচ্চে" শব্দ উদ্ভূত, তার সঙ্গে ক্যান্টনীয় "লুং-চী" মিশে গিয়ে "লোংচু" শব্দ তৈরি হয়েছিলো, আমার উল্লিখিত সবগুলি তথ্যই এই অনুমান সমর্থন করে। অবশ্য লিখিত সাহিত্য না-থাকলে কোনো শব্দার্থ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায় না, তবু সব তথ্য মিলিয়ে দেখলে আমাদের মানতেই হবে "লোংচু"র একমাত্র সম্ভবপর সংস্কৃত প্রতিশব্দ হ'লো "অমৃত"।'

'চলুন, সিদ্ধেশ্বরবাবু, অমৃতের ক্রিয়াকলাপ স্বচক্ষে দেখে আসবেন,' গম্ভীর গলায় এ-ক'টি কথা উচ্চারণ ক'রে ডক্টর বটব্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

জীপ থামলো অরণ্যের প্রান্তে; তারপর একটি ঢালু বনপথ বেয়ে আধ ঘণ্টা ধ'রে অবতরণ: আমরা বীরপল্লীতে পৌঁছলাম। পেয়ালার তলাকার গর্তের মতো জায়গাটা, উপরে আর-একটি ওল্টানো নীল পেয়ালা যেন ঢাকনার মতো, উঁচু-নিচু পাহাড়ের ফাঁকে খানিকটা শ্যামল

সমতল। পাখির ডাক ছাড়া শব্দ নেই, পাতার ঝিরঝির ছাড়া শব্দ নেই, আমাদের জুতোর শব্দও ঘাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। দশ-বারোখানা কুটির—বোঝা যায় কোনো-এককালে বাসযোগ্য ছিলো, কিন্তু এখন জীর্ণ, চালে খড় নেই, বাঁশের বেড়া খ'সে পড়ছে, মাটির ভিটে বহু বর্ষায় বিধ্বস্ত। যা ছিলো এককালে উঠোন, এখন সেখানে (এই শীতের শেষেও) লম্বা-লম্বা ঘাস আর আগাছার জঙ্গল। বহুদিন ধ'রে এই চাখেসাং পল্লী প'ড়ে আছে অমার্জিত ও অসংস্কৃত; ঋতুর পর ঋতু, বছরের পর বছর, প্রকৃতি যা ক্ষয় করেছে তার পরিপূরণ ঘটেনি—আর এই ভাঙাচোরা ঘরগুলোর দাওয়ায়, কেউ শুয়ে, কেউ আধো শুয়ে, কেউ হেলান দিয়ে, ঝিমন্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিশ্চল, নির্বাক, আপাতত সময়ের দ্বারা অস্পৃষ্ট: সেই উনপঞ্চাশজন। মেয়েরা সবাই পীতকান্তি, পুরুষেরা গৌরবর্ণ বা তাম্রবর্ণ বা শ্যামল। এই সুন্দর অরণ্যভূমিতে, এই গভীর শান্তি ও স্তব্ধতার মধ্যে জীবিকাজনিত শ্রম থেকে মুক্ত—কী না হ'তে পারতো এরা, মানুষের কোন স্বপ্নকে না মূর্তি দিতে পারতো? বৈভ্রাজ কাননে ভ্রাম্যমাণ কিন্নর-কিন্নরী; অলিম্পাসে অমরসমাবেশ; বৈকুণ্ঠধামে স্বর্বেশ্যাসমেত ইন্দ্রাদি দেবগণ: এই সব ছবি, একের পর এক, আমার মনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেলো। আমাকে প্রথমেই যা আঘাত করলো তা ওদের চোখ-ধাঁধানো যৌবন ও নগ্নতা। পুরুষদের কটিতটমাত্র আবৃত, কিন্তু মেয়েরা সম্পূর্ণ আবরণহীন: এক-একটি পুরুষ যেন তরুণ হেরাক্লেস বা আপোলো, বা বৈদিক দীপ্তিশালী আদিত্য, বা দ্রৌপদীর স্বয়ংভরসভায় অর্জুন। খাজুরাহো ও কোনারক, রুবেন্স ও রঁদা, টিৎসিয়ানো, দ্যলাক্রোয়া, ইয়ান স্টেন—বহু চিত্র, বহু মূর্তি, বহু স্মৃতি আমার মনের মধ্যে ভেসে-ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো। কিন্তু, যা নিতান্তই পশুর সরলতা ও সৌন্দর্য, অথবা যাকে বলা যায় নিশ্বসিত জড়বস্তুর নয়নমোহন লাবণ্য, যা ওরা অমন অনাবিল-ভাবে চোখে দেখার সুযোগ দিলো আমাকে, তা ঐ শিল্পীরা কেউ চিত্রিত

করতে পারেননি, কেউ পারেননি মানুষের মুখশ্রী থেকে তার মনোজাত কলুষ সম্পূর্ণ বর্জন করতে। সেই গতি, সেই চঞ্চলতা, সেই প্রাণ-হিল্লোল, যার দ্বারা একইভাবে উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে রচিত চিত্র ও কল্পিত দেবদেবী—যা আমাদেরও আশান্বিত ও অস্থির ক'রে তোলে—এই নিমীলচক্ষু, রিক্তবল উনপঞ্চাশ জনে তার তিলপরিমাণ চিহ্ন নেই। ওদের মুখমণ্ডল ওদের নিতম্বের মতোই মসৃণ, প্রশান্ত ও ভাবলেশহীন; দেখে মনে হয় যেন ওরা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন; ওদের ঘিরে-ঘিরে কোনো স্বপ্ন রচনা করা যায় না। আমি বুঝলাম ওদের মস্তিষ্ক থেকে চিন্তা সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত হ'য়ে গেছে, ওরা শূন্য এখন, এক-একটি অন্তঃসারবর্জিত আধার; ওদের মনের ধ্বংসকে আহার ক'রে-ক'রে অক্ষয় হ'য়ে আছে ওদের রূপযৌবন। আমরা ঘুরে-ঘুরে বার-বার দেখতে লাগলাম ওদের, কেউ চোখ ফেরালো না। আমার সঙ্গীরা হাততালি দিলেন, ক্যামেরা খুলে ছবি তুললেন, ওদের রক্তের চাপ পরীক্ষা করলেন; ওরা একই রকম নিঃসাড় হ'য়ে রইলো। নির্বেদ—আমাদের পক্ষে ধারণাতীত নির্বেদে ওরা আচ্ছন্ন। আমি কিছুক্ষণ পরে আর তাকাতে পারলাম না; এক বিশাল বিষণ্ণতা আমাকে অভিভূত করলো, আমার মনে হ'লো আমি সমগ্র মানবজাতির অপমৃত্যুর ছবি দেখছি।

'ওরা ম'রে যাচ্ছে,' ফেরার পথে ডক্টর বটব্যাল বলতে লাগলেন, 'বিনা কষ্টে, বিনা বোধে বিনা প্রতিরোধে ম'রে যাচ্ছে। রোগ, জরা, অপুষ্টি বা কোনো দৈবদুর্বিপাক নয়—ওদের মৃত্যুর কারণ হ'লো নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও নিরাপত্তা, সংঘাতের অভাব, সংগ্রামের অভাব, স্বেচ্ছাচারে অপ্রতিহত অধিকার। ওরা প্রমাণ করছে যে কোথাও কোনো বাধা যদি না থাকে, যদি পরিবেশ হয় সর্বতোভাবে সর্বদা শুধু অনুকূল, তাহ'লে জীবনজনিত ক্লান্তির চাপেই ধ্বংস হ'য়ে যায় জীবন।

একটা খুব সাধারণ ও ছোটো উদাহরণ নিন : সন্তান। সন্দেহ নেই, জীবন-নাট্যে সন্তানই নেয় আমাদের শত্রু ও ঘাতকের ভূমিকা, তারই জন্মক্ষণে আমাদের মৃত্যুর মুখবন্ধ রচিত হয়, এবং সে সাবালক হ'য়ে উঠলে আমাদের পদচ্যুতি অনিবার্য। কিন্তু, সন্তানের সঙ্গে সংঘাত ও অচেতন প্রতিযোগিতার ফলেই আমাদের জীবনতৃষ্ণা বেড়ে যায়; আমরা শিখি—ক্ষীয়মাণ শরীর সত্ত্বেও নানা নতুন কৌশলে জীবনটাকে আঁকড়ে থাকতে, হেরে গিয়েও একটা হার না-মানার জেদ জন্মায় আমাদের মধ্যে। ঐ বীরগোষ্ঠী অমৃতফল খুঁজে না-পেলে কী হ'তো তা সহজেই ভাবা যায়; এতদিনে শতাধিক সাবালক পুত্রকন্যা ও তাদের সন্ততি নিয়ে একটি সুখে দুঃখে বিরোধে ও বন্ধুতায় ভরা জীবন্ত মানব-সংসার গ'ড়ে উঠতো এই ডিঙ্গু উপত্যকায়; তাহ'লে ওরা বাধ্য হ'তো চেষ্টাপরায়ণ হ'তে, চাষ করতে, ফসল ফলাতে, নতুন জমি দখল ক'রে নিতে, নতুন বাসস্থল তৈরি করতে, তাহ'লে কোনো-কোনো প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে ও বিবাহে যুক্ত হ'তো ওরা : তাহ'লে মানুষের আবহমান ইতিহাস হঠাৎ এক জায়গায় এসে এমন নাটকীয়ভাবে, ভয়াবহভাবে থেমে যেতো না। কিন্তু লোংচু ফল ওদের দেবতা ক'রে দিতে পারলো না, শুধু মানবিক বৃত্তিগুলিকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিলো।'

আমি জিগেস করলাম, 'ওদের বাঁচাবার কি কোনো উপায় নেই?'

'কোনো উপায় নেই,' উত্তর দিলেন হেমকান্ত ভৌমিক। 'আমরা অনেক রকম চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কোনো চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি। আগে ওদের একটিমাত্র জীবলক্ষণ ছিলো মৈথুনকামনা, তা চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দ্রুতবেগে পতনের দিকে এগোচ্ছে। এখন আর কোনো ইচ্ছে নেই ওদের, আর ইচ্ছা—বৌদ্ধ ভাষায় তৃষ্ণা—তা-ই আমাদের দুঃখের আকর, কিন্তু তা-ই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের সব ইচ্ছে আসলে বাঁচার ইচ্ছে, আমাদের সব দুঃখ আসলে মৃত্যুভয়। এই দুই মৌলিক বৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের

নিজ-নিজ সত্তায় অনুভূতি উদ্গত হয়, স্থায়িত্ব পায়। সেই কেন্দ্র থেকে চ্যুত হ'য়ে গেছে লোংচুভোজীরা। আমরা প্রথম এসে লক্ষ করেছিলাম ওদের স্মৃতিশক্তি ওদের বাক্‌শক্তির মতোই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ; নিজেদের নাম ভুলে গেছে ওরা, গুনতে ভুলে গেছে ; দিন ও রাত্রির প্রভেদ অনুভব করলেও সকাল ও বিকেলের পার্থক্য অনুভব করে না। আর এই এক বছরের মধ্যে ওদের স্মৃতি ও সময়চেতনা একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছে ; ফলত ওরা যে "আছে" তাও ওরা অনুভব করে না, আর অতএব ওরা যে মারা যাচ্ছে তাও জানে না। স্মৃতিরহিত, সময়চ্যুত অস্তিত্ব সম্ভব হ'তে পারে প্রলয়ের পরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর, কিন্তু তাঁরও থাকে স্বপ্ন, যে-স্বপ্নকে আমরা শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি ব'লে শনাক্ত করি। কিন্তু মানুষের পক্ষে সময় ও স্মৃতি অপরিহার্য—কিংবা বলা যায় স্মৃতির জন্য তার সময়চেতনা অক্ষুণ্ণ থাকে ; তা থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়লে "জীবন" আর সম্ভব হয় না। তাই ঐ উনপঞ্চাশজনকে এখনই মৃত ব'লে ঘোষণা করতে দোষ নেই। আপনি ওদের জন্য চিন্তিত হবেন না, সিদ্ধেশ্বরবাবু, আর দু-সপ্তাহের মধ্যে ওদের মোহময় তন্দ্রা চিরনিদ্রায় অবসিত হবে। আমরা তাই শকুনের মতো অপেক্ষা করছি এখানে, ওদের শবগুলি আমাদের গবেষণার পক্ষে বিশেষ জরুরি। আমাদের আশা, শবব্যবচ্ছেদ ক'রে লোংচুর ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে নতুন জ্ঞান আমরা আহরণ করতে পারবো।'

'বলতে গেলে সেটাই শেষ আশা,' এবারে কথা বললেন ডক্টর মাহেশ্বর। 'আপনি হয়তো কোনো সময়ে এ-বিষয়ে কিছু লিখবেন, সিদ্ধেশ্বরবাবু, তাই আপনাকে কয়েকটা তথ্য জানিয়ে রাখছি। লোংচুর মধ্যে চারটে ভিন্ন-ভিন্ন উপাদান পাওয়া গেছে ; তাদের নাম দেয়া হয়েছে ভাস্কন (VN) মোটন (MT) অক্সিন (XN) ও স্টেরিন (ST)। ভাস্কনের ফলে জন্মনিরোধ ঘটে, মোটনের ফলে কামোদ্দীপনা ও চিরযৌবন; অক্সিন দেয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য আর স্টেরিন আনে বন্ধ্যাত্ব ও বুদ্ধিলোপ।

উপাদানগুলি যে-মাত্রায় লোংচুতে পাওয়া যায় তাতে পরিবর্তন ঘটালে কী-ফলাফল ঘটবে বা ঘটতে পারে তা-ই নিয়ে এখন বারোজন বিজ্ঞানী দেশে-বিদেশে গবেষণা করছেন। এবং—আরো জরুরি প্রশ্ন : স্টেরিনকে অন্যগুলো থেকে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব কিনা, না কি অন্য তিনটির সংযোগেরই একটি উপজাতক হ'লো স্টেরিন। যদি স্টেরিন বাদ দিয়ে অন্য তিনটিকে অনাহত অবস্থায় পাওয়া যায় আর সেই তিনটিকে বিশ্লিষ্ট করা যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে আমরা তৈরি করতে পারবো একটি নতুন অব্যর্থ জন্ম-নিরোধক, একটি শক্তিশালী রতিবর্ধক রসায়ন, আর সেই সঙ্গে—ভাবতেও রোমাঞ্চ হয় আমাদের—এমন একটি ভেষজ, যা বৃদ্ধকে দেবে নবযৌবন, আর রোগের আশঙ্কা বহুগুণ কমিয়ে মানুষের গড় আয়ু একশো বছরে তুলে দেবে। তখন আমরা ঘোষণা করতে পারবো মানব-ইতিহাসে এমন এক নবযুগ, যা এতদিন শুধু কবিকল্পনায় আবদ্ধ ছিলো। অবশ্য এই সব রঙিন সম্ভাবনা নিয়ে অগ্রিম উৎসাহিত না-হওয়াই ভালো, কেননা এই উপাদানগুলিকে ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন করা যায় কিনা, বা লোংচুর ফলন কী-উপায়ে আরো প্রচুর হ'তে পারে, এ-সব পরীক্ষা এখনো আরম্ভও হয়নি, আর পৃথিবীতে যার পরিমাণ অতি অল্প তা অস্ত্রনির্মাণে কাজে লাগলেও চিকিৎসায় ফলপ্রসূ হ'তে পারে না। কিন্তু প্রথমে, সকলের আগে, সর্বনাশী স্টেরিনকে বিশ্লিষ্ট করা দরকার—এখনো, দশমাসব্যাপী চেষ্টার পরেও তা সম্ভব হয়নি, এবং তা না-হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো দিকে এগোবার কোনো কথাই ওঠে না। যদি এমন হয় যে শেষ পর্যন্ত তা অসম্ভব থেকে গেলো, কিংবা যদি স্টেরিনকে বিশ্লিষ্ট করলে অন্য উপাদানগুলি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে—' ডক্টর মাহেশ্বর মুহূর্তের জন্য থামলেন।

'—তাহ'লে?'

'তাহ'লে অগত্যা লোংচু গাছটিকে নির্বংশ না-ক'রে উপায় থাকবে না—পাছে ঐ উনপঞ্চাশ জনের মতো অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী এই

বিষাক্ত অমৃতের আস্বাদ পায়। কিন্তু এই সুরম্য ও ধনোৎপাদক অরণ্যভূমির উপর জীবাণুধ্বংসী বোমা না-ফেলে কী ক'রে তা সম্ভব হ'তে পারে, সেও এক নিদারুণ সমস্যা।' ডক্টর মাহেশ্বরের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'লো; অবশিষ্ট পথ বিজ্ঞানীরা আর কথা বললেন না।

আমি, অমিতা সান্যাল

১

পরীক্ষার খাতা দেখতে-দেখতে মাঝে-মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছেন। রাত এখন এগারোটা, বাড়ি চুপচাপ, চমৎকার নিরিবিলি সময়, ভেবে-ছিলেন শোবার আগে অন্তত দশখানা দেখে উঠবেন আজ—কিন্তু এগোচ্ছে না, চোখের সামনে আঁকিবুঁকিগুলো মাঝে-মাঝেই অস্পষ্ট, আঙুলের ফাঁকে নীল পেন্সিল নিশ্চল। এদিকে তাঁর এক বাণ্ডিল বাকি এখনো, আর সময় আছে আর মাত্র সাতদিন।

না, কোনো বৈষয়িক বা পারিবারিক সমস্যা নয়। বরং বলা যায় ব্যক্তিগত—কিন্তু কী থাকতে পারে ব্যক্তিগত তাঁর জীবনে, তিনি, এক প্রৌঢ়া বিধবা, মাষ্টারি আর নাতি-নাৎনিদের মধ্যে যিনি অনেকদিন হ'লো নিজেকে ভাগ ক'রে দিয়েছেন! আসলে কোনো সমস্যাই নয়, তাঁর জীবনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সত্যি বলতে—নেহাৎই মন-গড়া এক ব্যাপার, কারো খেয়ালের ফানুস, কারো মগজ থেকে ছিটকে-পড়া দুটো শব্দ—আর তাই কিনা তাঁর জরুরি কাজে বাধা দিচ্ছে, যেহেতু এক উচ্চাভিলাষী যুবক কোনো-এক তুচ্ছ বিষয়কে টেনে-হিঁচড়ে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে ডক্টরেটের থীসিস লিখতে চায়! এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হ'তে পারে।

হাস্যকর—যে-প্রশ্ন নিয়ে যুবকটি তাঁর কাছে এসেছিলো, সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবান্তর এক প্রশ্ন, তাঁরই নিজের বিষয়ে, কিন্তু তাঁর কল্পনার মধ্যেও কখনো যা ছিলো না, এবং যা প্রথম শুনে তাঁর মনে হয়েছিলো বটুক-গবেষকটি মানসিকভাবে ঠিক সুস্থ নেই। অথচ এখন, এই নিরিবিলি রাত্তিরে, মনে-মনে যেন তারই উত্তর হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি—যদিও তাঁর এক বাণ্ডিল খাতা এখনো বাকি, আর সময় আছে আর সাতদিন মাত্র।

'আপনি অমিতা সান্যাল, হিরণ্ময়ী মহিলা-বিদ্যাপীঠে দর্শনের অধ্যাপিকা?' অচেনা যুবকটি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো—এত বিনয় তার

ভঙ্গিতে, এত বিস্ময় তার দৃষ্টিতে, যা এক ক্ষুদ্র কলেজের অখ্যাত অধ্যাপিকার কখনোই প্রাপ্য হ'তে পারে না। একটুক্ষণ সে তাকিয়ে রইলো তাঁর মুখের দিকে, কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলো। অমিতা সান্যাল ঠাণ্ডা গলায় জিগেস করলেন, 'কী চাই আপনার?'

তিন মিনিটের মধ্যে জানা গেলো যে সে, হিমাংশু ভৌমিক, বাংলা সাহিত্যে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত, সে এই দুপুর-রোদ্দুরে চ'লে এসেছে সুদূর সিঁথি থেকে প্রথমে চেৎলায় তাঁর কলেজে, তারপর কলেজ থেকে ঠিকানা নিয়ে যাদবপুরের গলির মধ্যে খুঁজে-খুঁজে তাঁর বাড়িতে—শুধু এই কথাটুকু জানার জন্য যে তিনি, হিরণ্ময়ী মহিলা-বিদ্যাপীঠের অধ্যাপিকা অমিতা সান্যাল, কখনো নীলকণ্ঠ রায়কে চিনতেন কিনা।

'কে নীলকণ্ঠ রায়?' 'কবি—কবি নীলকণ্ঠ রায়,' নরম গলায় জবাব দিলো হিমাংশু, সারা মুখে হেসে, ঈষৎ আত্মচেতনভাবে, যেন রঙের টেক্কা টেবিলে ফেলছে, এমনি তার ধরনটা। 'আমি তাঁকে নিয়েই গবেষণা করছি।'

ও—সেই 'আধুনিক' কবি নীলকণ্ঠ রায়, যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে মারা গেলেন, তাঁকে নিয়েও 'গবেষণা'! প্রবীণ অধ্যাপিকার ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটলো, কেননা তিনি গবেষণা বলতে বোঝেন অতি সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক আলোচনা, বা লুপ্ত অথবা বিস্মৃতপ্রায় পুরোনোর পুনরুদ্ধার এবং তাঁর এও বিশ্বাস যে কালের পরীক্ষা যা উত্তীর্ণ হয়নি তা পণ্ডিতের আলোচনার অযোগ্য। সম্প্রতি তিনি অনেকবার যা ভেবেছেন সেই কথাটাই আবার বললেন মনে-মনে—'সত্যি, আমাদের শিক্ষার মান কোথায় নেমে যাচ্ছে!' আর মুখে, অস্ফুট স্বরে—'তা আমার কাছে কী-জন্য ···?' 'আপনি কখনো চিনতেন কি নীলকণ্ঠ রায়কে?' আগ্রহের আতিশয্যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো যুবকটি, হাতের বইটাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলো। 'আমি? না তো।' তৎক্ষণাৎ জবাব শোনা

গেলো, 'কিন্তু আমি শুনেছি আপনার স্বামী স্কটিশ চার্চে তাঁর সহপাঠী ছিলেন।' 'তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি জানি না।' 'কিছুই জানেন না? কখনো দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে?' 'কী আশ্চর্য, স্বামীর সহপাঠী হ'লেই চিনতে হবে নাকি?' স্পষ্ট বিরক্তি তাঁর কথার সুরে, কিন্তু উৎসাহী যুবকটি তাতে দমলো না। 'দয়া ক'রে একটু ভেবে দেখবেন কি? যদি কখনো—অনেক আগে—আমরা তো অনেক পুরোনো কথা ভুলে যাই? ··· আপনার স্বামীর মুখে নীলকণ্ঠ রায়ের কথা শুনেছিলেন কি কখনো? ·· কোনো চিঠিপত্র আছে কি? ··· যদি কিছু মনে পড়ে আপনার—যে-কোনো তথ্য যা আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ—'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি সময় নষ্ট করছেন,' তরুণ গবেষকের আবেদনে একটু রূঢ়ভাবেই বাধা দিলেন অমিতা সান্যাল, 'আপনার নিজেরও, আর আমারও।' শরীরের ঊর্ধ্বাংশ আরো একটু নুইয়ে দিয়ে হিমাংশু বলতে লাগলো, 'আমি হয়তো অসময়ে এসেছি, আপনি ব্যস্ত আছেন, কিন্তু কেন এলাম সেটুকু অন্তত বলতে দিন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—' একটু থামলো সে, হাতের বইখানার পাতা ওল্টালো—'নিশ্চয়ই জানেন নীলকণ্ঠ রায়ের কবিতায় "অমিতা সান্যাল" নামটা চারবার পাওয়া যায়?' প্রৌঢ়া মহিলার মনে পড়লো ও-রকম একটা কথা কে যেন তাঁকে বলেছিলো একবার—বোধহয় বাংলা বিভাগের কাবেরী ঘোষ, তার বয়স অল্প, চলতি কালের বই পড়ার বদভ্যাস এখনো কাটাতে পারেনি—বলেছিলো খুব হালকাভাবে অবশ্য, একটা অর্থহীন খুচরো খবর হিশেবে শুধু, কিন্তু হিমাংশু ভৌমিকের বলার ভঙ্গিটা একেবারেই ভালো লাগলো না তাঁর। উত্তর দিলেন, 'আর তাই, যেহেতু আমার ঐ নাম—আপনি তথ্যের খোঁজে আমার কাছে ছুটে এলেন! আমি বুঝতে পারছি না আপনি থীসিস লিখছেন, না উপন্যাস।' বদ্ধপরিকর গবেষক এই বিদ্রূপেও অপ্রতিভ হ'লো না, বরং এবার পিঠ সোজা ক'রে বসলো,

গম্ভীর চোখে তাকালো। 'আমি ধ'রে নিয়েছি নামটা কাল্পনিক, কিন্তু কল্পনার তলায় কখনো কোনো তথ্য থাকে না তাও তো নয়।' 'এ-ক্ষেত্রে কিছুই নেই।' 'একটা কথা জিগেস করছি, আপনার উত্তর পেলে অশেষভাবে কৃতজ্ঞ হবো.। কবিতাগুলি প'ড়ে আপনার নিজের কী মনে হয়েছে?' 'আমি পড়িনি।' 'কখনো পড়েননি?' এই প্রথম ম্লান দেখালো উৎসাহী যুবকটিকে; তা লক্ষ ক'রে, মনে-মনে খুশি হ'য়ে, অমিতা সান্যাল আবার বললেন, 'আমি কবিতা বেশি পড়ি না। আর আজকাল কবিতা যা হচ্ছে, পড়লেও বোঝার কোনো উপায় নেই।' হিমাংশু ঢোঁক গিললো এই কথা শুনে, পুরো এক-মিনিট-মতো চুপ ক'রে রইলো, তারপর যেন হঠাৎ মনস্থির ক'রে জোরালো গলায় ব'লে উঠলো, 'কিন্তু এই কবিতাটায় না-বোঝার মতো কিছুই নেই। এই যে, একত্রিশ পৃষ্ঠায়—"অভর্থনা ও বিদায়" ব'লে যেটা আছে—একবার প'ড়ে দেখবেন? বলেন তো আমি প'ড়েও শোনাতে পারি।' 'না, না, শোনাতে হবে না—' আগন্তুককে আরো তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার জন্য অধ্যাপিকা অনিচ্ছা কাটিয়ে বই হাতে নিলেন, উক্ত রচনাটিতে চোখ বুলিয়ে গেলেন একবার, ভালো-মন্দ কিছুই লাগলো না। তবে হ্যাঁ—"অমিতা সান্যাল" নামটা—সাঁওতাল মেয়ে কৃষ্ণকলি নয়, পল্লীবালিকা রঞ্জনা নয়, উজ্জয়িনীর মালবিকা নয়—একেবারে পদবিসুদ্ধ জলজ্যান্ত এক বাঙালি ভদ্রমহিলার নাম—সত্যি, কবিতা নিয়ে কী ছেলেমানুষি হচ্ছে আজকাল! কোনো মন্তব্য না-ক'রে হিমাংশুর দিকে বই এগিয়ে দিলেন, কিন্তু হিমাংশু বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলো সেই মুহূর্তে, বা তিনি অসাবধান—বইটা হঠাৎ প'ড়ে গেলো তাঁর হাত থেকে, তুলতে গিয়ে মুখপত্রের ছবিটা বেরিয়ে পড়লো। সেই ছবির দিকে একবার তাকালেন অধ্যাপিকা—ঝাপসা, খুব ঝাপসাভাবে নীলকণ্ঠ রায়ের মুখটা তাঁর চেনা মনে হ'লো।

২

আর এখন, রাত্তির যখন সাড়ে-এগারোটা পেরিয়ে গেছে, বাড়ি চুপচাপ, আশেপাশের জানলাগুলোতে আলো নিবে যাচ্ছে একে-একে, আবার সেই বই খুলে ছবিটা দেখছেন তিনি—টেবিল-ল্যাম্পের আলোয়, পরীক্ষার খাতার বাণ্ডিল সরিয়ে রেখে। অর্থহীন প্রশ্ন—নিশ্চয়ই—কোনো উপাধিপ্রার্থী উদ্‌ভ্রান্ত যুবক ছাড়া সকলের কাছেই তা-ই—কিন্তু তবু, যে-মুহূর্তে ছবির মুখটা তাঁর চেনা মনে হ'লো (যদিও নিরাশ গবেষকটিকে তার কিছুই তিনি বুঝতে দেননি), তখন থেকে অস্পষ্ট একটা কৌতূহল তিনি অনুভব করছেন, নিজের সঙ্গে একটা খেলা খেলছেন যেন, যাতে অন্য কারো কোনো অংশ নেই। একটি আধ-বয়সি শাদা-পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোককে দেখা যাচ্ছে—মুখটা গোল ছাঁদের, চওড়া কাঁধ, নাকের বাঁশি ফোলা-ফোলা, ঠোঁট পুরু, পাৎলা চুল চাঁদির উপর ল্যাপ্টানো, ভুরুর মধ্যিখানে কপালের চামড়া রাগি ধরনে কুঁচকে আছে। মনে হয় কোনো এঞ্জিনিয়র বা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, শক্তপোক্ত কেজো কোনো সংসারী মানুষ, যার চেহারা নেহাৎ চলনসইয়ের চাইতে একটুও ভালো হবার দরকার নেই। আর এই নাকি একজন কবি—বিখ্যাত কবি!

হ্যাঁ, দুঃখের বিষয়, বিখ্যাত। যুবকটি এসে যাবার পরে এই চারদিনে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছেন তিনি, এক কপি কিনেও এনেছেন 'নীলকণ্ঠ রায়ের কবিতা', অন্য কাজের ফাঁকে-ফাঁকে পাতা উল্টেছেন। এবড়ো-খেবড়ো ছন্দ, অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষা—না আছে মধুসূদনের কল্লোল, না রবীন্দ্রনাথের ঝংকার, কোথাও শোনা যাচ্ছে না কোনো সুন্দরী ঝর্নার নূপুরের বোল বা বিদ্রোহী বীরের উদাত্ত কণ্ঠ—অনেক সময় মনে হয় যেন হেঁয়ালি বা রসিকতা বা স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপ বকছে কেউ; কিন্তু তবু (বা হয়তো সেইজন্যই) আজকালকার ছেলেরা নাকি 'নীলকণ্ঠ' বলতে মূর্ছা যায়, কাগজে-পত্রে অনবরত লেখালেখি হচ্ছে তাকে নিয়ে, সম্প্রতি এক

চিত্রাভিনেত্রীও এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রিয় কবির নাম নীলকণ্ঠ রায়। কলেজে কোনো-কোনো সহকর্মিণীর মুখে অমিতা সান্যাল এ-সব কথা সহাস্যে শুনেছিলেন, ধ'রে নিয়েছিলেন এটাও এক উটকো হুজুগ—ছেলেদের সরু প্যাণ্ট আর দাড়ি, আর ছুকরিদের সালওয়ার-কামিজের মতোই কিছুদিন মাতামাতি চলবে যা নিয়ে। নীলকণ্ঠ বিষয়ে ইংরেজি বিভাগের চল্লিশোত্তর প্রধান অধ্যাপিকার উৎসাহ দেখেও তিনি বিচলিত হননি, কেননা—সকলেই জানে—অনেক সময় বয়স্করা তরুণদের ফ্যাশানের গাঙে গা ভাসান শুধু নিজেদের 'জলচল' রাখার ঈষৎ অসাধু উদ্দেশ্য থেকে;—এই সবই উপেক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কাবেরী ঘোষ যখন বললো নীলকণ্ঠের কবিতা সামনের বছর থেকে বাংলা অনার্স-কোর্সে পাঠ্য হ'তে পারে, তখন অমিতা সান্যালকে থমকাতে হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য—তার মানে কয়েক হাজার ছেলেমেয়েকে পড়ানো হবে প্রতি বছর, বছরের পর বছর, আর সেই ডিগ্রিধারী কয়েক হাজারের মধ্যে আবার কয়েকজন নীলকণ্ঠ রায়ের কবিতা পড়াবে, এমনি আবার ··· তাহ'লে কি ··· তাহ'লে কি বাংলাদেশে অনেকের কাছে নীলকণ্ঠ রায় হ'য়ে উঠবেন তেমনি একজন, যেমন আমার কাছে মধুসূদন, বা রবীন্দ্রনাথ, বা শেলি, বা কীটস; তাঁকে নিয়েও অনেক গল্প গ'ড়ে উঠবে, ছড়িয়ে পড়বে সত্যে-মিথ্যায় মেশানো অনেক রটনা—যেমন আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ বা শেলির বিষয়ে—আজ থেকে ধরা যাক কুড়ি বছর বা চল্লিশ বছর পরে? কিন্তু অত দূরে যাবার দরকার কী—এখনই, এই তো সেদিন, আমি যখন বললাম ভদ্রলোক দেখতে কিন্তু মোটেও কবির মতো নন, কাবেরী তক্ষুনি ব'লে উঠলো, 'কেন, সুন্দর তো!'—এদিকে এক উচ্চাভিলাষী উদ্‌ভ্রান্ত যুবক উঠে-প'ড়ে লেগেছে নীলকণ্ঠের জীবনী লেখার জন্য, তল্লাশ করছে 'অমিতা সান্যাল' নামের পিছনে কোনো তথ্য লুকিয়ে আছে কি নেই।

বেচারা হিমাংশু ভৌমিক! এমন একটা বিষয় নিয়েছে যাতে আগে কেউ আঁচড় কাটেনি। শেষটায় না বানিয়ে-ছানিয়ে পাতা ভ'রে দেয়।

কিন্তু ··· ছবিটা আমার চেনা-চেনা লাগছে কেন? আমি কি কখনো চিনতাম এই ভদ্রলোকটিকে? দেখেছিলাম?

একটা ঝাপসা ছবি, বইয়ের ছবিটার মতো নয়—মাথা-ভর্তি চুল ছিলো মনে হয়, আরো ছিপছিপে, অমন রাগি আর সন্দিহান নয় মুখের ভাব, বরং যেন ভিতু আর সন্ত্রস্ত—না, বইয়ের ছবিটার মতো নয়, তবু কোথায় যেন আদল পাওয়া যাচ্ছে—যেমন ছেলের মুখে মাঝে-মাঝে বাবার—কিন্তু কী ক'রে বলি, এত ঝাপসা, এত ফ্যাকাশে, এত দূরে, প্রায় মনেই পড়ে না। সেই কতকাল আগে ··· আমার বিয়ের ঠিক পরের বছর বোধহয় ··· কালিম্পঙে বেড়াতে গিয়ে ··· যাঁর সঙ্গে দু-চারবার খুব আলতোভাবে দেখা হয়েছিলো আমাদের, পথ চলতে-চলতে কখনো, বাজারে কিছু কিনতে গিয়ে হয়তো বা—'এই যে,' 'কী-রকম?', 'আজ সকালে খুব কুয়াশা হয়েছিলো,' 'ঐদিকে একটা ঝর্না আছে দেখেছেন?'—এই ধরনের বাক্যবিনিময়ের পরে যাঁর সঙ্গে কথাবার্তা আর এগোতো না, এই কি সেই নীলকণ্ঠ রায়? নীলকণ্ঠ রায় নাম ছিলো কি ভদ্রলোকের? কোনো সময়ে আমার স্বামীর—ঠিক বন্ধু নন, সহপাঠী ছিলেন কি? তা-ই তো শুনেছিলাম তখন, তা-ই তো মনে পড়ে। ···ঠিক? কী ক'রে বলি—এত ঝাপসা, এত দূরে, আর এত অল্প দেখাশোনা। একদিন এসেছিলেন কি আমাদের বাড়িতে? ··· কোনো-এক বিকেল, কোনো-এক বারান্দা, পেয়ালা-ভর্তি অরেঞ্জ পিকোর সুগন্ধ ··· কবে ··· কোথায়? স্বামী বেঁচে নেই, কাকে জিগেস করি? কে আমার স্মৃতিকে সাহায্য করবে?

—কিন্তু কী-সব বাজে কথা ভাবছি! এদিকে এই খাতার বাণ্ডিল, আর সময় আছে আর মাত্র সাতদিন।

হাত বাড়িয়ে একটি খাতা টেনে নিলেন অমিতা সান্যাল, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম-ছাপানো ব্রাউন-রঙের মলাটওলা খাতাটা স্পর্শ করামাত্র,

সেই নোট-মুখস্থ-করা একই একঘেয়ে ও বুদ্ধিহীন উত্তর চোখে দেখামাত্র, তাঁকে আক্রমণ করলো এমন এক অবসাদ যার সঙ্গে লড়াই করার মতো একফোঁটা শক্তিও আর খুঁজে পেলেন না নিজের মধ্যে। কুৎসিত কাজ —এই খাতা দেখা—শুধু টাকার জন্য ক'রে যাচ্ছি বছরের পর বছর! স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে এইখানে আমার জীবন এসে ঠেকেছে—শুধু একটি উপার্জনের যন্ত্র; মেয়ে, জামাই, ছেলে, ছেলের-বৌ, নাতি-নাৎনি —এদের সন্তোষসাধনের একটি উপায় শুধু, এদের আরো বেশি বিলাসিতার জোগানদার। এরাই আমার আপন জন, আমার জীবন এদেরই নিয়ে—অর্থাৎ আমার নিজের কোনো জীবন নেই।

ঠেলে সরিয়ে রাখলেন পরীক্ষার খাতা, কবিতার বইটা খুলে আবার কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়লেন। 'অভ্যর্থনা ও বিদায়' ব'লে কবিতাটাতে একটি নায়িকার আলেখ্য আঁকা হয়েছে—আলেখ্য নয়, আভাসমাত্র, একটি রেখাও স্পষ্ট নয়, এক পার্বত্য দৃশ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যে 'অমিতা সান্যাল' নামটা না-থাকলে প্রায় বোঝাই যেতো না কোনো নারীর উল্লেখ আছে এই কবিতায়। অন্য ছুটি ছোটো কবিতায় এই তথাকথিত 'অমিতা সান্যাল'-এর সঙ্গে লেখকের আবার দেখা হচ্ছে (অন্তত তা-ই ধ'রে নিতে হবে পাঠককে), একবার তারার আলোয় এক বিধ্বস্ত প্রাসাদের সামনে, আর-একবার বনের মধ্যে ঝাপসা জ্যোৎস্নায়। 'অভ্যর্থনা ও বিদায়'-এ আছে বিকেলের আলো আর ছায়া, আর অন্য ছুটিতে রাত্রি, আর অন্ধকার, অথবা এমন এক আলো যার পরতে-পরতে অন্ধকার মিশে আছে। অমিতা সান্যাল, কবিতা প'ড়ে তেমন অভ্যস্ত নন, 'হেঁয়ালি-কবিতা' প'ড়ে আরো কম অভ্যস্ত, অনেক চেষ্টা ক'রে এটুকু তথ্য উদ্ধার করতে পারলেন। আর তারপর হঠাৎ, যেমন সুইচ টিপলে আলো জ্ব'লে ওঠে, তাঁর মনে প'ড়ে গেলো।

একদিন আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি (মানে, নীলকণ্ঠ রায়), আমার স্বামী দেখতে পেয়ে ডেকে আনলেন

তাঁকে—যেন অনিচ্ছায় এলেন ভদ্রলোক, মেলামেশায় তেমন পটু নন, ধরনধারন একটু খাপছাড়া-মতো—কাচে-ঢাকা বারান্দায় ব'সে ছিলাম আমরা, বাইরে বিকেলবেলার রোদ্দ্যুর, পাহাড়ি দৃশ্য, উঁচু-নিচু ছায়া আর রোদ্দ্যুর ছিলো বাইরে; তিনি (মানে, নীলকণ্ঠ রায়) চায়ের সঙ্গে অনেকগুলো আদা-বিস্কুট খেয়েছিলেন, বা অন্য কোনোরকম বিস্কুটও হ'তে পারে। 'আমরা রংপুতে যে কুইনিনের কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম, সেই গল্প খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, বা হয়তো আমার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী স্বামীর মুখে গাছপালা বনজঙ্গলের গল্প—নিজে বেশি কথা বলেননি, মাঝে-মাঝে কোনো ঠাট্টার কথায় আচমকা হেসে উঠছিলেন শব্দ ক'রে। সন্ধে হ'য়ে এলো, আমরা একসঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম তিনজনে, কয়েক মিনিট পরে তিনি একটু আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে অন্য একটা রাস্তা নিলেন—আর তারপর আর দেখা হয়নি, ঐ অমিশুক স্বল্পভাষী খাপছাড়া মানুষটির কথা আর ভাবিওনি কখনো। লক্ষ করার মতো কেউ নয়, মনে রাখার মতো কোনো ঘটনা নয়—অথচ এতকাল পরে ফিরে এলো সেই বিকেল, সেই বারান্দা, সেই উঁচু-নিচু ছায়া আর রোদ্দ্যুর—এই কবিতাটায়। হিমাংশু ভৌমিক কি ঠিক দরজায় টোকা দিয়েছে তাহ'লে, তার অনুমান বিশুদ্ধ পাগলামি নয়?

অমিতা সান্যালের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো হঠাৎ; টের পেলেন তাঁর মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে—অনেকদিন পর ও-রকম হ'লো ব'লে সেই অনুভূতিটা অদ্ভুত লাগলো।

কিন্তু তাঁর ন্যায়শাস্ত্র-পড়া মন তাঁকে উদ্ধার করলো তখনই।

৩

—না, কিছুরই কোনো প্রমাণ নেই। এই কবিতাগুলির লেখক, আর যাঁর সঙ্গে কালিম্পঙে আমাদের দেখা হয়েছিলো—এরা কি একই নামের

তুই আলাদা ব্যক্তি হ'তে পারেন না? বইয়ের ছবির সঙ্গে মিল? কিন্তু আমার কি মনে আছে তিনি দেখতে ঠিক কেমন ছিলেন? দু-চারবার দেখা ··· পাহাড়ি শহরে রাস্তায় যেমন হ'য়ে যায়, বেড়ানো ছাড়া আর তো কোনো কাজ নেই সেখানে ··· আর বিকেলবেলার বারান্দায় ব'সে একদিন ··· সুগন্ধি দার্জিলিং চা ··· আমার স্বামী ছাড়া অন্য একজন··· কিন্তু দেখতে কেমন জানি না, হয়তো আমি তাঁর দিকে বেশি তাকাইনি। তাঁর নাম সত্যি কি ছিলো নীলকণ্ঠ রায়? কী জানি, হয়তো 'রায়' নয়, 'চৌধুরী', হয়তো 'নীলকণ্ঠ' নয়, 'সিতিকণ্ঠ'। আচ্ছা, ধ'রে নেয়া যাক এই বিখ্যাত কবির সঙ্গেই, বা পরে যিনি বিখ্যাত কবি হলেন তাঁর সঙ্গেই দেখা হয়েছিলো আমাদের—তাহ'লেও প্রশ্ন: 'অমিতা সান্যাল' নামের কোনো বিশেষ তাৎপর্য আমরা কেন খুঁজবো? অতি সাধারণ নাম, কত আছে বাংলাদেশে—আর আমার নাম যে অমিতা তা হয়তো তিনি জানতেনও না। না কি জানতেন? শুনেছিলেন দু-একবার? সেটা অসম্ভব নয়, আমার স্বামী হয়তো বলেছিলেন, 'অমিতা, এবার চা দাও,' বা ঐ রকম কিছু—আর সান্যাল পদবি তো আমার স্বামীর, সেটা তাঁর আগে থেকেই জানা ছিলো। কিন্তু এ থেকে কোনো মীমাংসায় পৌঁছনো যায় না—এমনও হ'তে পারে যে নামটা তিনি লিখেছিলেন শুধু কানে শুনতে ভালো লেগেছিলো ব'লে, ছন্দে ঠিক ব'সে গিয়েছিলো ব'লে—ছয়ের বদলে পাঁচ অক্ষরের কোনো নাম হ'লে, ধরা যাক অমিতা মৈত্র বা মীরা সান্যাল হ'লে, তাঁর কোনো কাজে লাগতো না। আর তাছাড়া—আমি যদিও কবিতার কিছু বুঝি না, তবু এটুকু দেখতে পাচ্ছি যে নামটা প্রত্যেকবারই লাইনের শেষে এসেছে, আর 'সান্যাল' খুব সুবিধাজনকভাবে মিল জুগিয়ে গেছে 'চাতাল', 'অন্তরাল', 'কঙ্কাল' আর 'চিরকাল'-এর সঙ্গে। অর্থাৎ, কবিতা লেখার সাধারণ মিস্ত্রিগিরির জন্যই ঐ নামটার দরকার হয়েছিলো—বলা যেতে পারে একটা পেরেক বা ইস্কুরুপের চাইতে ওটা বেশি কিছু নয়, ওর পিছনে গূঢ়তর কোনো

অর্থের সন্ধান শুধু সে-ই করতে পারে, একটা ডি. ফিল ডিগ্রি পাবার নেশায় যার কাণ্ডজ্ঞান সুদ্ধু লোপ পেয়েছে।

তাঁর পুরোনো ধারণায় ফিরে আসতে পেরে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, তর্কটাকে কয়েকটা বৈকল্পিক সূত্রের আকারে সাজিয়ে নিলেন মনে-মনে :

১। কবি নীলকণ্ঠ রায়ের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি।

২। কবি নীলকণ্ঠ রায়ের সঙ্গে বহুকাল আগে আমার দেখা হয়েছিলো, কিন্তু তিনি আমার নাম জানতেন না।

৩। কবি নীলকণ্ঠ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, তিনি আমার নামও জেনেছিলেন, কিন্তু—যদি না অন্য কোনো অমিতা সান্যালকে তিনি ভেবে থাকেন, তাহ'লে ঐ নামটা নিঃসন্দেহে তাঁরই রচিত, অন্তত আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

৪। কবিতার অস্পষ্ট নায়িকার সঙ্গে আমার বা অন্য কোনো অমিতা সান্যালের কোনো সম্পর্ক নেই; নামটা ব্যবহৃত হয়েছিলো শুধুমাত্র ছন্দ, মিল ও ধ্বনির প্রয়োজনে। (এটাই সবচেয়ে বেশি সম্ভবপর ও বিশ্বাসযোগ্য, তবু সম্ভাবনা হিশেবে এও বিবেচ্য হ'তে পারে যে—)

৫। আমার সঙ্গে কবি নীলকণ্ঠ রায়ের দেখা হয়েছিলো, তিনি আমার নাম জেনেছিলেন, মনে রেখেছিলেন, আর দৈবাৎ—আকস্মিক-ভাবে—অচেতনভাবে—

এখানে এসে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন অমিতা সান্যাল, যেন তাঁর নিজের চিন্তায় নিজেই ভয় পেয়ে। আস্তে, অতি মৃদু হাতে আর-একবার খুললেন বইটা, সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটা নতুন প্রশ্ন তাঁকে ছেঁকে ধরলো। শিরোনামা কেন 'অভ্যর্থনা ও বিদায়', যদিও কবিতার মধ্যে আসা অথবা চ'লে যাওয়ার উল্লেখমাত্র নেই? 'তন্ময় চাতাল'—মানে? বারান্দা অর্থে 'চাতাল' হ'তে পারে, কিন্তু জড়বস্তু 'তন্ময়' হ'তে পারে না,

তবে কি বক্তাই তন্ময় ছিলেন—বারান্দায় ব'সে? 'দূরত্বের নীল পর্দা ন'ড়ে ওঠে'—'নীল' বললেই আকাশ মনে হয়, কিন্তু আকাশ তো ন'ড়ে ওঠে না কখনো—কী বলা হচ্ছে? পর্দা ··· ছিলো কি একটা ··· ঘর আর বারান্দার মাঝখানকার দরজায় ··· নীল রঙের? ··· পড়ন্ত বেলা, উচুনিচু ছায়া আর রোদ্দুর, আর সন্ধ্যা, একটি নির্জন পথ, আর অন্ধকার—সবই আছে এই কবিতায়, আর ঐ সব রেখা, ছায়া, আলো আর অন্ধকার দিয়ে যেন তৈরি করা হয়েছে কোনো-এক অনির্ণেয় অমিতা সান্যালকে। এমনি মনে হ'লো প্রৌঢ়া মহিলাটির, পাঁচবারের বার কবিতাগুলি পড়ার পর—মনে হ'লো যেন কালিম্পঙের সেই কিছুক্ষণ সময়, যা কিছুক্ষণ পরেই আর ছিলো না, এই লাইনগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে তা চলছে এখনো। ··· তা-ই কি? সত্যি কি তা-ই? না কি আমিও অসম্ভব কথা ভাবতে শুরু করলাম, অত্যুৎসাহী যুবক-গবেষকটির মতোই, হয়তো তারই কল্পনায় সংক্রমিত হ'য়ে?

অমিতা সান্যাল দ্রুত হাতে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন, দ্রুত চোখে মিলিয়ে দেখলেন তারিখগুলোকে। কবির জন্ম ১৯০২, 'অভ্যর্থনা ও বিদায়' লেখা হয়েছিলো ১৯৩৭-এ, অন্য দুটি বিয়াল্লিশ সালে, আর আমরা কালিম্পঙে গিয়েছিলাম ··· আমার বিয়ের পরের বছর, তার মানে ··· ১৯২৭ ··· মানে, নীলকণ্ঠের বয়স তখন পঁচিশ—মাত্র পঁচিশ, ছেলেমানুষ!—আর আমিও তা-ই, একুশ বছরের মেয়ে আমি তখন। কথাটা মনে হওয়ামাত্র অমিতা সান্যাল এক অস্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করলেন, তাঁর বয়স যে কখনো একুশ ছিলো সেটা এক বিস্ময়কর ঘটনা ব'লে মনে হ'লো তাঁর—আমি তখন কেমন ছিলাম, কেমন দেখতে ছিলাম, সেদিন সেই বিকেলবেলার বারান্দায় আমাকে কেমন দেখাচ্ছিলো? হঠাৎ একটা ইচ্ছার চাপে কেঁপে উঠলেন তিনি, সেই সময়কার নিজেকে একবার চোখে দেখার জন্য—এখনই, এই মুহূর্তে, এই নিরিবিলি রাত্তিরে আশে-পাশে কেউ যখন জেগে নেই। কেউ জেগে নেই তবু কেমন

লজ্জা, পা টিপে-টিপে উঠে গেলেন, চাবি ঘোরাবার ন্যূনতম শব্দ ক'রে আলমারি খুললেন, ফোটোর অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এসে বসলেন টেবিলে, ঝুঁকে পড়লেন পুরোনো একটা ছবির উপর। অনেক পুরোনো, হলদে হ'য়ে গেছে—হঠাৎ যেন চিনতেই পারলেন না ছবিটা কার। তাঁর ছাত্রীরা, যাদের তিনি 'খুকি' ব'লে ভাবেন, তাদেরই মতো একজন—ছিপছিপে, গোল গাল, কপাল অতি মসৃণ, আর গলার উপর চামড়া কেমন আঁট হ'য়ে বসেছে, আর চুল কেমন ঘন আর কুচকুচে কালো—ছেলেমানুষ, নেহাৎ ছেলেমানুষ। এখনকার আমাকে যারা চেনে, ভালোবাসে বা বাসে না, যারা আমাকে 'মা' বা 'দিদানি' বা 'অমিতা-দি' বা 'মিসেস সান্যাল' ব'লে ডাকে, তারা ভাবতেও পারবে না আমি একদিন এইরকম দেখতে ছিলাম। মুখখানা ··· মন্দ নয়, ঠিক সুন্দর বলা যায় না যদিও ··· আর ভাবটা কেমন কাঁচা, কেমন সরল আর ঈষৎ বোকা ধরনে নিশ্চিন্ত—যেন সবেমাত্র বেরিয়েছে এই পৃথিবীতে, এখনো পথঘাট চেনে না আর সেজন্যে কোনো আপশোশও নেই।

তাহ'লে এই সেই মেয়ে, যে কালিম্পঙে তার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলো, বসেছিলো কাচে-ঢাকা বারান্দায় অন্য দু-জনের সঙ্গে, উঁচু নিচু পাহাড়ি দৃশ্যের মুখোমুখি? সেই মেয়ে—আমি। সেই অন্য মানুষটি—নীলকণ্ঠ রায়। অল্প বয়সে—আমিও জানি—কত তুচ্ছ কারণে দুলে ওঠে বুক, কত মুহূর্ত কেটে যায় যেন স্বপ্নের মধ্যে—আর সেই পঁচিশ বছরের যুবকটি, যে ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত কবি হবে, সেও হয়তো ··· হয়তো কিছু কল্পনা করেছিলো, কিছু অনুভব করেছিলো—সেদিন, সেই কালিম্পঙের বিকেলবেলায়। কিন্তু তা-ই যদি হবে তাহ'লে নিশ্চয়ই সত্যিকার নামটা লিখতো না, সেটা যে ভদ্রতা নয় এটুকু সাংসারিক বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই ছিলো? আর তাছাড়া, এ কি সম্ভব যে সেই ছোট্ট ঘটনাটুকু—'ঘটনা' বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও নয়—সেই কয়েকটি মুহূর্ত, অতি সাধারণভাবে কাটানো কিছু

সময়—সেটা দশ বছর পরেও, পনেরো বছর পরেও মনে ছিলো তার—বা হঠাৎ, অন্য সব ভাবনা আর ব্যস্ততা পেরিয়ে নাড়া দিয়েছিলো তার মনের মধ্যে? আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে মনে রেখেছিলো তা কি সম্ভব? আর তাই কি লিখেছিলো সত্যিকার 'অমিতা সান্যাল' নামটাই—ইচ্ছে ক'রে, যেন মনে-মনে হেসে—যাতে আমার চোখে পড়ে কোনো-একদিন, মনে প'ড়ে যায়? আশ্চর্য নয় কি যে কোথাকার কোন টাটকা-পাশ-করা ছোকরা—নিজে না-বুঝে, শুধু অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে, তুলে আনলো আমার জন্য আমারই এক টুকরো হারানো জীবন, আমি নিজে কখনোই যা খুঁজে পেতাম না? পুরোনোর পুনরুদ্ধার—তা শুধু অক্ষরের নয়, লিখনের নয়, জীবনের ব্যাপারেও হ'তে পারে, এই কথাটা আগে আমি ভাবিনি কখনো। আশ্চর্য—সেই মানুষ, যাকে খুব ঝাপসাভাবে দু--চারবার মাত্র দেখেছিলাম আমি—এতকাল পরে আবার সে ধ'রে ফেললো আমাকে, যেন মধ্যবর্তী দীর্ঘ বছরগুলি কিছুই নয়—আমাকে ফিরিয়ে দিলো সেই দিন, সেই বিকেল, সেই বারান্দা, আমার একুশ বছর বয়সের কয়েকটি মুহূর্ত।

—কী হয়েছে আমার, কী ভাবছি আমি, কী অর্থ হয় এ-সবের?

অমিতা সান্যাল কপালে একবার হাত বুলোলেন, জোরে নিশ্বাস নিলেন একবার; বন্ধ করলেন ছবির অ্যালবাম, কবিতার বই; সামনের শাদা দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ ক'রে—রাত্তির যখন একটা প্রায় বাজে, গভীর নির্জন নিরিবিলি সময়, আর তাঁর মনে অস্থিরতা, এক প্রশ্নের ঢেউ ওঠা-পড়া করছে অবিরাম। কত কিছু এখন মনে হচ্ছে আমার—কিন্তু এগুলি তো আমারই ভাবনা, যেন একটা গল্প বানিয়ে যাচ্ছি মনে-মনে, হিমাংশু ভৌমিক আমার মুখে যা শুনতে চায় সেই গল্প—কিন্তু অন্যজন কী ভেবেছিলো তা কী ক'রে জানবো? সে বেঁচে থাকলে জিগেস করতাম তাকে—হ্যাঁ, আমি সোজা চ'লে যেতাম ঐ

পাৎলা-চুলের চওড়া-নাকের ভদ্রলোকটির কাছে—'বলুন সত্যি ক'রে, আপনি কি আমাকে ভেবেই এ-সব কবিতা লিখেছিলেন? আপনার "অমিতা সান্যাল" কি আমি?' কী উত্তর দিতো সে? 'আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।' এড়িয়ে যেতো আলগোছে, আমাকে অল্প কথায় বিদায় দিতো, যেমন আমি সেদিন হিমাংশুকে দিয়েছিলাম। হয়তো মনে-মনে বলতো, 'আমার কথা আমি কবিতাতেই ব'লে দিয়েছি—আর কেন?' —তা-ই তো, এই অাঁকাবাঁকা ছন্দের কয়েকটা লাইন—এ ছাড়া আর কিছুই নেই: এ থেকেই নিংড়ে নিতে হবে উত্তর, যদি আদৌ কোনো উত্তর থাকে কোথাও।... কিন্তু কথাটা হচ্ছে, হিমাংশু কাল আসবে—আমি স্পষ্ট অনিচ্ছার ভাব দেখিয়েছিলাম, কিন্তু আমি জানি সে না-এসে ছাড়বে না—কী বলবো আমি তাকে কাল? এমন একটা ব্যাপার—প্রমাণ করা যেমন অসম্ভব, অপ্রমাণ করাও ঠিক তেমনি। কী বলবো? পরিষ্কার 'না', এক কথায় 'না'—'আমি চিনতাম না নীলকণ্ঠ রায়কে, কখনো দেখিনি, কিছুই জানি না তাঁর বিষয়ে, কিছুই শুনিনি।' ব্যস, মামলা ডিসমিস, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মন থেকে এই বাজে অশান্তিটা ঝেড়ে ফেলা গেলো।... কিন্তু নাছোড় হিমাংশু যদি তার পরেও আবার জিগেস করে, 'আপনি কি এর মধ্যে কবিতাগুলি আবার পড়েছিলেন? আপনার কী মনে হ'লো জানতে পারি?'

৪

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। বিছানার একপাশে বাবলি ঘুমিয়ে আছে, এগারো বছরের বাড়ন্ত মেয়ে—সারাদিন যেখানে থাক যা-ই করুক, রাত্রে দিদানির কাছে তার শোয়া চাই। ঘুমের মধ্যেও কী হালকা তার নিশ্বাস, আবছা আলোয় কী সুন্দর তার মুখখানা।

গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলেন একটু, কপালে চুমো খেলেন। আর দু-এক বছরের মধ্যেই কিশোরী হ'য়ে উঠবে ও, একদিন একুশে পড়বে, এমনকি আমার মতো ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও পৌঁছবে একদিন। এখনকার বাবলিকে দেখে কে সে-কথা কল্পনা করতে পারবে? আর এখনকার আমি, আর ছবিতে ঐ একুশ বছরের মেয়েটা—কে বলবে একই মানুষ! ··· সত্যি, মানুষের জীবনটা কী? জন্ম নেয়, বড়ো হ'য়ে ওঠে, কিন্তু কাজকর্ম করে, কিছু সন্তানের জন্ম দেয়—কোন অন্ধকারে মিলিয়ে যায় তারপর। আমার স্বামী—আর পঞ্চাশ বছর পর কে তাঁকে মনে রাখবে। এই বাবলি, এখনো তার দিদানি না-হ'লে চলে না—কিন্তু তারও কাছে আমি ছায়া হ'য়ে যাবো একদিন। শেষ পর্যন্ত—কারোরই কোনো চিহ্ন থাকে না। কিন্তু কারো-কারো থাকে। মৃত্যু, যা সকলের পক্ষেই সর্বনাশ, তাও দেখছি কারো-কারো বেশ কাজে লেগে যায়। যেন পুঁজিপাটা মাটির তলায় লুকানো ছিলো, এইবার মহাজনের হাতে সুদে খাটছে। গবেষণা ··· গোয়েন্দাগিরি ··· এমনকি 'অমিতা সান্ন্যাল'কে শনাক্ত করার চেষ্টা। অদ্ভুত—এই সেদিনও যে-মানুষটা বেঁচে ছিলো, হয়তো ট্রামে-বাস্-এ ঘুরে বেড়াতো, রাস্তায় বেরোলে কেউ চিনতো না—তাকে হঠাৎ গল্পের মানুষ ক'রে তোলা হচ্ছে। আমি জানতাম কালের পরীক্ষা পেরোনো অত সহজ নয়। কিন্তু হয়তো সেই পরীক্ষার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই, প্রথম থেকেই মিনিটে-মিনিটে তা চলতে থাকে, হয়তো সেই পাৎলা-চুলের চওড়া-নাকের মানুষটা এখনই উত্তীর্ণ, তার অন্য এক নতুন জীবন এরই মধ্যে শুরু হ'য়ে গেছে। আর এখন এক ভক্ত বটুক ছুটে এসে আমাকে জিগেস করছে সেই জীবনে আমার কোনো অংশ আছে কিনা। 'আছে কিনা' নয়—নিতে চাই কিনা, এ-ই হ'লো প্রশ্ন। কেননা ঐ কবিতার অমিতা সান্ন্যাল—সে হ'তে পারে যে-কেউ, অথবা কেউ নয়, এতবার পড়ার পরে আমি এখন আর একজন 'ভদ্রমহিলা' ব'লে ভাবতে পারছি না তাকে, আমার মনে হচ্ছে

সেও একটা শব্দ শুধু, বা ছবি, বা বলা যাক অছিলা—রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি বা মালবিকার মতোই—তবু কেউ-একজন আমাকে সেই কল্পনার জন্মস্থল ব'লে অনুমান করছে, আমিও মনে-মনে জানি সেটা অসম্ভব নয়, আমি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। কেউ নেই যে বলতে পারে ও-রকম হয়েছিলো বা হয়নি, যেহেতু আমাকে নিয়েই মামলা আর আমি তার একমাত্র সাক্ষী, তাই আমার ইচ্ছের উপরেই পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে, 'আমি যা বলবো তা-ই মেনে নেবে লোকেরা। ইচ্ছে, তুমি কোনদিকে যাবে? কেন, যা সত্য তা-ই বলতে দোষ কী? 'একবার দেখা হয়েছিলো কালিম্পঙে, আমরা বারান্দায় ব'সে চা খেয়েছিলাম একদিন—' দোষ কী? যদি কথাটা কোথাও ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে তাতেই বা আপত্তির কারণ কী হ'তে পারে? কেউ কিছু মনে করবে? কিন্তু আমার তো কোনো দায়িত্ব নেই এতে—সেই অন্যজন যদি কিছু ভেবে থাকে, বা অনুভব ক'রে থাকে, আমি কী করতে পারি? কেউ-কেউ অবিশ্বাস করবে আমার কথায়, হিমাংশুর লেখায়? ··· তা, অন্তত নীলকণ্ঠ প্রতিবাদ করতে পারবে না, সে নিজে সব বাদানুবাদের বাইরে চ'লে গেছে। অতএব আমি, অমিতা সান্যাল ··· আর কবিতার সেই অস্পষ্ট নায়িকা ···আমরা আস্তে-আস্তে মিশে যাবো পরস্পরের মধ্যে ··· হ'য়ে উঠবো একটা গল্প, সত্যে-মিথ্যায় মেশানো একটা রচনা ··· যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক, শেলিকে নিয়ে অনেক ··· তেমনি অন্য একজনের জীবনের মধ্যে জায়গা ক'রে নেবো আমি, যদিও তখন তার মুখের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়েও দেখিনি, আর যদিও আমি সারা জীবনে এই প্রথম নীলকণ্ঠ রায়ের কবিতা পড়লাম।

তাঁর এতক্ষণকার উত্তেজনা হঠাৎ তাঁকে ছেড়ে গেলো এবার, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়লো আরাম, মনে সুখ, প্রায় এক ছেলেমানুষি ধরনের প্রফুল্লতা। হ্যাঁ—এক গল্প, কোনো-কোনো বইয়ে, ফুটনোটে, লোকের

মুখে ··· এক ক্ষুদ্র কলেজের নগণ্য শিক্ষিকা ··· অনেকদিন ধ'রে যাঁর জীবন মানে দাঁড়িয়েছে শুধু চাকরি, আর ছেলে মেয়ে জামাই বৌ নাতি নাৎনি ··· এক বয়স্ক মধ্যবিত্ত অতি সাধারণ ভদ্রমহিলা ··· তার নাম এক নতুন পথে রওনা হ'লো আজ ··· আর থামতে পারবে না ··· চলবে বছরের পর বছর ··· লোকেরা ভাববে তা-ই নিয়ে, রং চড়াবে, কত কী বানিয়ে নেবে নিজেদের মনে ··· এই আমাকে নিয়ে, যে-আমি সমুদ্রে একটা বিন্দুর বেশি আর-কিছু নই। 'বাবলি, আমার সোনামণি,' নিচু গলায় গুনগুন ক'রে তিনি বলতে লাগলেন, অন্ধকারে ঘুমন্ত নাৎনির মুখের দিকে তাকিয়ে, 'বাবলি, তুমি বড়ো হ'য়ে জানবে তোমার দিদানি সারা জীবন ভ'রে শুধু মাষ্টারনি আর দিদানি ছিলো না, শুধু তোমার বাবার আর পিসিদের মা ছিলো না, সেও একদিন ··· তাকেও একদিন ··· কেউ ··· একজন অচেনা মানুষ ··· একবার ···

অমিতা সান্যালের চোখ জড়িয়ে এলো, গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেলো আস্তে-আস্তে, নাৎনির গা ঘেঁষে শুয়ে খুব শান্তভাবে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।